১০ই নভেম্বর স্মরণে

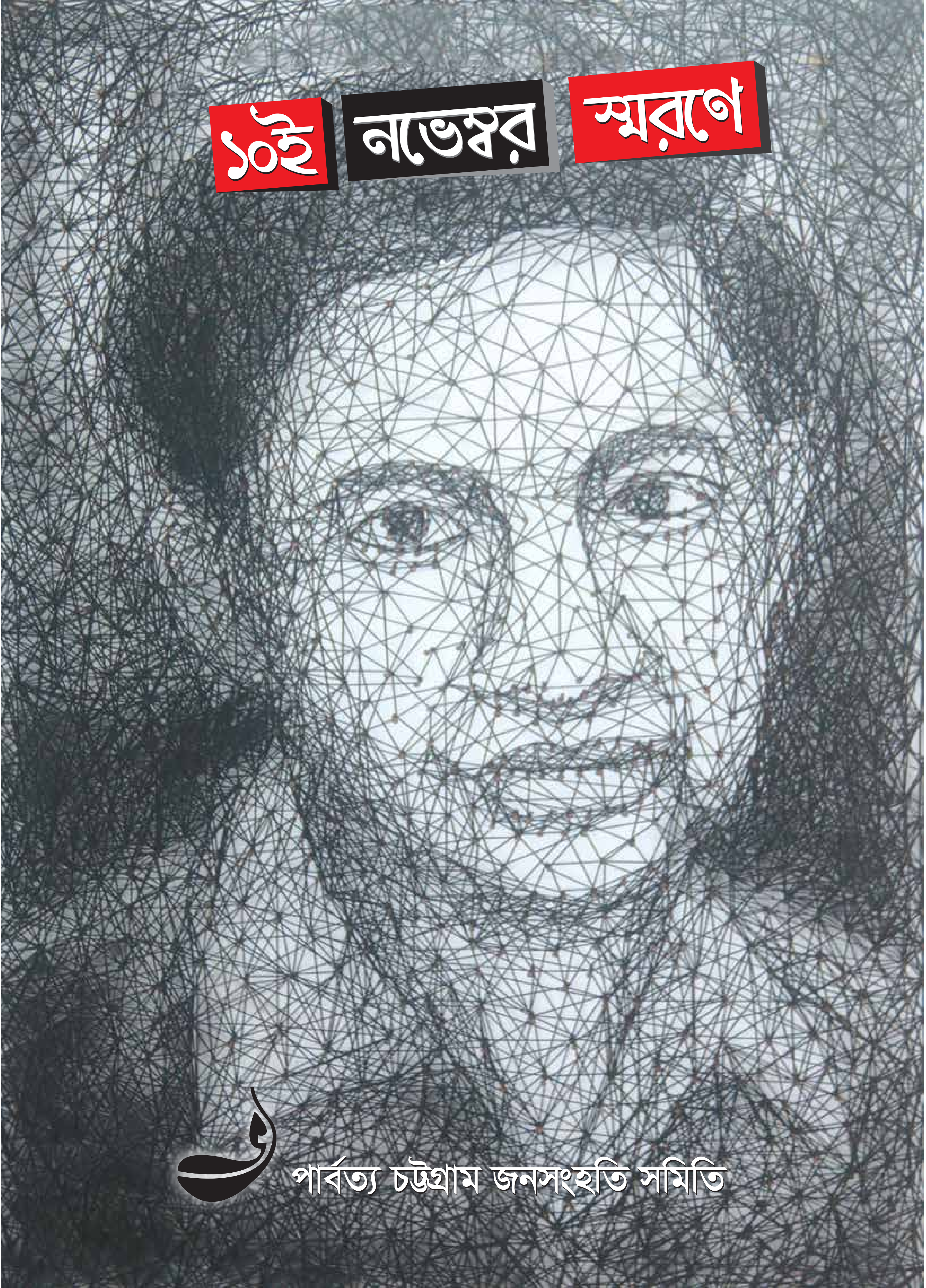

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ :
১০ নভেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদের ছবি
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতিকৃতি
মাধ্যম : Mix Media String and Nail on Board
শিল্পী : জুলিয়ান বম

প্রকাশনায় :
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৩

প্রবন্ধ: স্মৃতি তর্পণ ০৪-৩৭

এম এন লারমার স্বপ্নকে সামনে রেখে জুম্ম জনগণকে হতে হবে আরো সংগ্রামী ও প্রতিরোধী ● জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ০৪

এম এন লারমা ছিলেন বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার নেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয় ● রাজা দেবাশীষ রায় ১০

এম এন লারমার সংসদীয় সংগ্রামের কিছু অনালোচিত পাঠ ও বর্তমান বাস্তবতা ● মঙ্গল কুমার চাকমা ১৩

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: পিতা থেকে পৃথক ● পাভেল পার্থ ১৯

এখনও মিছিলে ধ্বনিত হয় এম এন লারমা ● দীপায়ন খীসা ২৪

চারু ও কারু শিল্পী গৌতম মুনি চাকমা অংকন ● সত্যবীর দেওয়ান ২৬

শিক্ষাগুরু চিত্ত কিশোর চাকমাকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু শিক্ষা ● আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক ২৮

রাম কিশোর চাকমার প্রয়াণ : আরেক সংগ্রামী জীবনের অবসান ● ধীর কুমার চাকমা ৩০

স্মৃতিপটে ১০ নভেম্বর ও দুটো কথা ● ত্রিজিনাদ চাকমা ৩২

জুম্ম তরুণ সমাজের চেতনায় এম এন লারমা ● বাচ্চু চাকমা ৩৫

কবিতা ৩৮

শহীদ বেদীতে ফিরে আসি বার বার ● আনন্দ জ্যোতি চাকমা ৩৮

আমি ইতিহাসে দেখেছি ● ফেলাযেয়া চাকমা ৩৮

প্রবন্ধ: বর্তমান পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ৩৯-৫৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিকতা ও জাতিগত নির্মূলীকরণ প্রসঙ্গে ● সজীব চাকমা ৩৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা ও যুব সমাজের করণীয় ● বিনয় কুমার ত্রিপুরা ৪৩

শাসকগোষ্ঠীর উন্নয়নের রোষানলে জুম্ম জনগণের অবস্থা ● জুয়েল চাকমা ৪৬

'ভাগ কর শাসন কর' নীতি ও জুম্ম জাতীয়তাবাদ ● পলাশ চাকমা জুম্মো ৫০

বিশেষ প্রতিবেদন ৫৪-৫৯

● মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৭৮তম জন্মদিবস পালিত ৫৪

● লংগদু ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে এবং হামলাকারীদের বিচারে অগ্রগতি নেই ৫৮

সংবাদ প্রবাহ ৬০-৬৫

জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৬০

সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল ৬০

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন ৬২

সংগঠন সংবাদ ৬৬-৭৯

সম্পাদকীয়

আজ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর এই দিনে বিভেদপন্থী, জাতীয় কুলাঙ্গার, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য মহান নেতা এম এন লারমা। কাপুরুষোচিত ন্যাক্কারজনক হামলায় নৃশংসভাবে খুন হন পানছড়ি আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারি পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি), সার্জেন্ট সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা (অর্জুন)। এই শোকাবহ দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহান নেতাসহ এই আট বীর বিপ্লবী সেনানীকে জানাচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম।

চার কুচক্রী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হীন আশায় কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী, আরো বেশি দুর্বার।

দেশে এখন সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের হীন তৎপরতা চরম আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মুক্তি আসেনি। সত্তর দশকে মহান নেতা এম এন লারমা যেভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রতিফলন দেশের সকল ক্ষেত্রে আজ প্রতীয়মান হয়। দেশের মাঝি-মাল্লা-কৃষক-শ্রমিক-মেথর-রিক্সা চালক-নিষিদ্ধ পল্লীর মা-বোনদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আসেনি। এখনো পূর্বের মতো সমাজে শোষণ-নিপীড়ন প্রকট আকারে বিদ্যমান রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী আগের মতো এখনো জুম্ম জনগণসহ দেশের অবহেলিত-উপেক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভূমির অধিকার অস্বীকার করে চলেছে। দেশের সর্বত্র আদিবাসী জাতিসমূহের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠেছে।

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের শাসকগোষ্ঠী সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। শাসকগোষ্ঠী যে দলেরই হোক না কেন তারা পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারা একাধারে সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলছে অপরদিকে সেটেলার বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বন বিভাগের তথাকথিত বনায়ন, সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অস্থানীয় বহিরাগতদের নিকট জুম্মদের প্রথাগত মালিকানাধীন জুমভূমি নির্বিচারে লীজ প্রদান, পর্যটনসহ নানা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট কথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য শাসকগোষ্ঠী চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।

সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিন বাহিনীর উপস্থিতিতেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অপরদিকে সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে নির্বিচারে ধর-পাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ, জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলছে। জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আদালতে হাজিরা দিতে গেলে আইন-আদালতের কোন তোয়াক্কা না করে আদালতের আঙ্গিনা থেকে সেনা ও গোয়েন্দা সদস্যরা ধরে নিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে অমানুষিকভাবে মারধর করে আরো সাজানো মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে পাঠানো হচ্ছে।

এম এন লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জুম্ম জনগণসহ নিপীড়িত-নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষ তথা সমগ্র মানবজাতির মুক্তি নিয়ে এম এন লারমার স্বপ্নকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অধিকতর সংগ্রামী, প্রতিরোধী, প্রতিবাদী হই। আসুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অধিকতর আন্দোলন সংগঠিত করি এবং চুক্তি বাস্তবায়নে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করে এম এন লারমার স্বপ্নকে সফল করি।

প্রবন্ধ: স্মৃতি তর্পণ

এম এন লারমার স্বপ্নকে সামনে রেখে জুম্ম জনগণকে হতে হবে আরো সংগ্রামী ও প্রতিরোধী

॥ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ॥

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ও মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় অন্যতম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। আলোচনা সভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য নিম্নে পত্রস্থ করা হলো – তথ্য ও প্রচার বিভাগ

আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে রাঙ্গামাটি শহর থেকে অনতিদূরে মহাপূরম নামক গ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই দিনটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত, স্মরণীয় দিন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত একজন বিপ্লবীর জন্ম এই দিনে। এই পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর মত একজন ব্যক্তি জন্ম নিয়েছিল সেটা অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, অনেকেই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সকল ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ যে পার্বত্য অঞ্চল সেই পশ্চাদপদ সমাজ জীবনে এমন একজন বিপ্লবীর জন্ম, এটা তো সহজে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে যে, এটা নির্ভর করে ব্যক্তির উপর। ব্যক্তি যদি সমাজব্যবস্থার গভীরে গিয়ে তার অবস্থানকে, তার প্রতিবেশীদের, তার জনগণের বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারেন তাহলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত একজন মহান বিপ্লবী জন্ম হতে পারে। আজকে সেই বাস্তবতা আমরা দেখি এবং এজন্য এটা নিঃসন্দেহে আমরা গর্বভরে বলতে পারি যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত বিপ্লবী আমাদের এই দেশে খুব কম ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করেছেন বা তাঁর জীবনকে বাস্তবে বৈপ্লবিক জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুধু এদেশের একজন বিপ্লবী নন, তিনি সারা বিশ্বের বিপ্লবী সমাজেরও একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে আমি মনে করি। আজকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম নিয়ে এবং তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের বিষয়গুলো আলোচনায় আনা যেতে পারে। কিন্তু আজকের এই সীমাবদ্ধ পরিসরে সেটা সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। তাঁর জীবনের কয়েকটা দিক, বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা হতে পারে, আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার পূর্ববর্তী আলোচকরা যা বলে গেছেন এবং যেভাবে তারা স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তাদের নীতি-আদর্শের আলোকে যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন আমি মনে করি তারা যথার্থভাবে এম এন লারমার জন্ম এবং জীবনের উপর কিছু কথা বলার চেষ্টা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সংগ্রামী সমাবেশ, আজকে আমি আমাদের মহান নেতা এম এন লারমার তাঁর জীবনের দুয়েকটি কথা বলে এবং সেই সাথে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করে আমার এই আলোচনা শেষ করতে চাই। এম এন লারমার জীবন সম্পর্কে আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি একটি পরিবারের একজন হিসেবে, একই পরিবারের একজন হিসেবে, আমি যা দেখেছি, তার মধ্যে হলো- পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যে ঘেরা, অসংখ্য নদী-নালা, ঝর্ণা, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সমাহারে ভরপুর এই পার্বত্য অঞ্চলে এম এন লারমা তাঁর জীবনকে গভীরভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই জন্যই তিনি ছোটবেলা থেকেই আমাদের এই পার্বত্য জুম্ম সমাজকে জানার এবং বুঝবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ছাত্র জীবন বা কৈশোর জীবন এবং তাঁর পরবর্তীকালের জীবন, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনোনিবেশ ইত্যাদি আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তাতে দেখেছি যে, তিনি যে কোন বিষয় ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরভাবে ধারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এজন্যই তিনি হতে পেরেছেন একজন মহান নেতা, একজন মহান বিপ্লবী।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় তিনি পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের স্বাধিকার, অধিকার এবং বাস্তবতা নিয়ে যে দাবি উত্থাপন করেছিলেন সে দাবির ভিত্তিতে পরবর্তীকালে তাঁরই প্রদর্শিত নীতি-আদর্শের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এবং একটি পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির প্রদত্ত পাঁচ দফা দাবি এম এন লারমার সেই ৭২ এর চার দফা দাবিরই একটা বিস্তারিত প্রতিফলন। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলে যে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটা প্রক্রিয়া চলছে, যদিও সেই প্রক্রিয়া আজকে বলা যেতে পারে সার্বিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে, তা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৭২-এ বলার চেষ্টা করেছিলেন, জুম্ম জনগণের স্বাধিকার-অধিকার নিয়ে গণপরিষদের ভিতরে এবং বাইরে বলার চেষ্টা করেছিলেন। ঠিক তেমনি ৭৩, ৭৪-এ জাতীয় সংসদেও সেভাবেই তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে কোন সময় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। অসীম সাহস নিয়ে, সীমাহীন দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, মানবতাবোধ এবং বিপ্লবী চেতনা নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য এই দেশের জাতীয় সংসদের সামনে তুলে ধরে যে ইতিহাস রচনা করেছেন সেটা আমরা ভুলতে পারি না। আজকে সেই কারণেই এবং সেই চেতনারই ভিত্তিতে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

> “ এম এন লারমা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ নিজেদের অধিকার নিয়ে, পরিচিতি নিয়ে, মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবেন এবং বেঁচে থাকার জন্য একটা জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করবেন। আমরা যদি বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকাই, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, এম এন লারমার স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে?

আজকে আমি স্মরণ করতে চাই, যে ব্যক্তির জন্ম পার্বত্য অঞ্চলের একটা প্রত্যন্ত এলাকায় সেই মানুষটির যে দর্শন যেটার ভিত্তিতে তিনি জীবনকে দেখেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থাকে সেভাবেই বিনির্মাণ করার আশা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার-অধিকারের প্রশ্নেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। এজন্য ’৭২-এর সংবিধানে জনগণের পক্ষে তাঁর যে দাবি উত্থাপন এবং তারই ধারাবাহিকতায় তাঁরই নেতৃত্বাধীন গঠিত জনসংহতি সমিতির যে আন্দোলন তার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছে বলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

সংগ্রামী সমাবেশ, সুধী সমাজ, আজকের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমরা কী দেখতে পাই? এম এন লারমা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ নিজেদের অধিকার নিয়ে, পরিচিতি নিয়ে, মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবেন এবং বেঁচে থাকার জন্য একটা জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করবেন। আমরা যদি বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকাই, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, এম এন লারমার স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে? আমরা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যারা এম এন লারমার জীবনদর্শনের সাথে যুক্ত হয়ে আছি, এই পার্বত্য অঞ্চলে যারা তাদের স্বাধিকার, অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে চলেছেন তারা কিন্তু সেখান থেকে সরে যেতে পারে না, এম এন লারমার স্বপ্নকে বৃথা যেতে দিতে পারে না। তাইতো এখনো পর্যন্ত, এমনকি আজকের আলোচনা সভায় আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তাতে আমরা দেখেছি যে, এম এন লারমার সেই স্বপ্ন, সেই আকাঙ্ক্ষা, তাঁর কাঙ্ক্ষিত শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজজীবন, যে সমাজজীবনে জাতিভেদ থাকবে না, সম্প্রদায়ভেদ থাকবে না, লিঙ্গভেদ থাকবে না, থাকবে না অর্থনৈতিকসহ সকল প্রকারের ভেদাভেদ, সে ধরনের ভেদাভেদমুক্ত একটা সমাজজীবন শুধু পাহাড়ে নয়, পার্বত্য অঞ্চলে নয়, সমগ্র বাংলাদেশে, সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন, তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন।

আজকে বাংলাদেশের সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী এম এন লারমার সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তথা পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করে চলেছে। যে কারণে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় আমরা সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করতে পারছি না।

আজকে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপর আকাশ নেই। তাদের জীবন আজকে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনীতিগত তথা সকল প্রকারের শোষণ-নিপীড়ন -নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে চলছে। আজকে সেই বাস্তবতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আমাদের বলতে হচ্ছে যে, আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার ন্যূনতম বাস্তবতা অর্জন করতে পারিনি।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক বাস্তবতার দিকে যদি আমরা আলোকপাত করি, পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতির দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা কী দেখতে পাই? বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সেনাশাসন, সেনাকর্তৃত্ব চলে আসছে। এখনও পর্যন্ত 'অপারেশন উত্তরণ' এর মধ্য দিয়ে এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সেনা কর্তৃত্ব, সেনাশাসন বিরাজমান। এখানে আজকে ৭ লক্ষ বহিরাগত বাঙালি মুসলমানের অবস্থান। যে কারণে আজকে জুম্ম জনগণ অতিদ্রুত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। আজকে এখানকার শাসনব্যবস্থা ১৯০০ সালের শাসনবিধির বদৌলতে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে প্রতিদিন লঙ্ঘন করে এখানকার মানুষের উপর ব্রিটিশের দেয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-নিপীড়ন অব্যাহত রেখে তারা তাদের সেই তথাকথিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আজকে এখানে জুম্মদের ভূমি অধিকার নেই। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী এখানে ভূমি অধিকার দেওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সেই ভূমির অধিকার এখনও পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের কাছে দিয়ে দেয়নি। যে কারণে আজকে জুম্ম জনগণের পায়ের তলায় মাটি নেই, তাদের বসতবাটি নেই। তাদের বেঁচে থাকার জন্য এই পার্বত্য অঞ্চলে যে সহায়-সম্পদ রয়েছে, সেটা এখনও জুম্ম জনগণের সীমা থেকে বহু বহু দূরে। সেজন্য আজকে এখানে ভূমি নিয়ে অহরহ নানা ধরনের জাতিবিরোধী, জুম্মস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা বিরাজমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও আমরা দেখেছি এখানে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে জুম্ম জনগণের উপর কমপক্ষে বিশটি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। তার সর্বশেষ হলো রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে সংঘটিত নারকীয় হামলা ও অগ্নিসংযোগ। আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে অহরহ অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এখানকার সামগ্রিক জীবনধারায় জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। আজকে এখানে রাজনৈতিকগতভাবে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলো যেগুলো পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সক্রিয় রয়েছে, তন্মধ্যে বিশেষ করে যে দল ক্ষমতাসীন সেই দল এই পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে সেই মৌলিক অধিকার ভণ্ডুল করার জন্য, নস্যাৎ করার জন্য ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার যে নীল নকশা ও ষড়যন্ত্র তা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আজকে তিন পার্বত্য জেলার পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো আওয়ামী লীগের, ক্ষমতাসীন দলের শাখা অফিসে পরিণত হয়েছে। সেই কারণে জুম্ম জনগণের তথা পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী মানুষের যে অধিকারটুকু পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনের মধ্যে স্বীকৃত আছে সেই অধিকারগুলো তারা ভোগ করতে পারে না, সেই অধিকার তারা তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে না। এই সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর নীল নকশা বাস্তবায়নে এই তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ তথাকথিত রাজনৈতিক ও গণপ্রতিনিধিত্বের ভূমিকা পালন করে চলেছে। যে ভূমিকা নিঃসন্দেহে আমাদের জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র। এখানে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের যে অবিচার, অত্যাচার, অনাচার চলছে, সেটার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না। এখানকার যে আইনকানুনগুলো আমাদের নিরাপত্তার জন্য রয়েছে সেই আইনগুলো আমাদের পক্ষে কাজে লাগানো হয় না। এখানে মিথ্যা ধারণা দিয়ে, মিথ্যা অভিযোগ এনে এবং এখানকার নানা দিক দিয়ে সমাজজীবনে বাধাগ্রস্ত করে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা, সেটা সম্পূর্ণভাবে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ও তাদের স্বার্থ রক্ষার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এজন্য পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক বাস্তবতায় আমরা বলতে পারি যে, আজকে আমরা জুম্ম জনগণ, চৌদ্দটি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহ বর্তমানে ভাসমান জনগোষ্ঠীতে জীবনধারণ করতে বাধ্য হচ্ছি। এটাই হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা। এখানে প্রতিদিন অহরহ অনেক অমানবিক ঘটনা সংঘটিত হয়, যে ঘটনাগুলোর কোন বিচার নেই, যে ঘটনাগুলোর আমরা কোন প্রতিবিধান করতে পারি না। এই বাস্তবতার মুখোমুখী হয়েও আমরা আমাদের জীবনের খোঁজে সংগ্রামে আমরা যুক্ত আছি। আজকে যা কিছু করি, যা কিছু বলার চেষ্টা করি, সরকার-শাসকগোষ্ঠী তার বিপরীতে তার ক্ষমতাগুলো অপব্যবহার করে থাকে।

আজকে বাংলাদেশে আমাদের পরিচিতি কী? সেই পরিচিতির ব্যাপারে আমাদের মহান নেতা ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, আমার পরিচিতি নিতান্ত আমারই। এখানে আমাদের সার্বিক পরিচিতি জাতীয় সংসদে প্রণীত সংবিধানে একেবারে নির্লজ্জভাবে প্রদান করেছিল যে, বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালি নামে পরিচিত হবে। সেই কারণে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের যে নীল নকশা, সেই নীল নকশা আজকে অধিকতরভাবে বাস্তবায়িত হতে আমরা দেখি। পাকিস্তান শাসনামলে আমরা দেখেছি, ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ হয়েছিল, সেই কাপ্তাই বাঁধের মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে এই পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা। সেই নীল নকশা ছিল দ্বিতীয় পদক্ষেপ। ১৯৫৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ আইন ছিল প্রথম পদক্ষেপ। আরো বলা যেতে পারে, ১৯৪৮ সালে বা ১৯৪৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন বহির্ভূত এলাকার যে অধিকার ছিলো সেটাকে খর্ব করে দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাইরে থেকে এখানে মানুষ প্রবেশ করা, বসতি স্থাপন করা। পাকিস্তান সরকার সেটা করেছিল অন্য ভাষাভাষী জাতির স্বার্থে।

পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পদক্ষেপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন এলাকার যে অধিকারটুকু ছিল সেটার নির্লজ্জভাবে খর্ব করতে আমরা দেখেছি। যে কারণে আমরা দেখেছি,

১৯৭২-এর সংবিধানে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছিল। এদেশের সরকার-শাসকগোষ্ঠী তার ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যে কারণে আমরা দেখেছি, ১৯৭৩ সালে রাতারাতি এখানে তিনটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে এখানে বহু বহু সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অসংখ্য অস্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ একটা বৃহত্তম কারাগারে পরিণত হয়েছে। সারাবিশ্বে এত বড় কারাগার আমরা কোথাও দেখি না। এই পার্বত্য অঞ্চল আর সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাই, এটা বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকেগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম কারাগারে পরিণত হয়েছে। যেখানে আমরা যারা বসবাস করছি, সেখানে আমাদের বুক ফুলিয়ে হাঁটবার পরিবেশ নেই। আমরা আমাদের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা খুলে বলতে পারি না।

আজকে চতুর্দিকে এই রূঢ় বাস্তবতার নিষ্পেষণে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে সুষ্ঠুভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে পারি না, নিশ্বাস ফেলতে পারি না। এই শ্বাসরুদ্ধকর বাস্তবতায় আমরা বসবাস করছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে এদেশের সরকার-শাসকগোষ্ঠী যা করছে, এই এলাকা শাসনের নামে শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন তথা জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির জন্য যে ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা বাস্তবায়িত করে চলেছে, আইন-শৃঙ্খলার নামে, উন্নয়নের নামে যা কিছু করছে সেটাকে আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, এই শাসন, এই আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, এই উন্নয়ন কার্যক্রম কোনটাই জুম্ম জনগণের স্বার্থের জন্য নয়, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নয়। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে সেই শাসনব্যবস্থায় সেনা কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার যে আইন সেই ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে ধরে রেখে এখানকার ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয় আইন-শৃঙ্খলার নামে, শাসনের নামে জুম্মদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই পর্যায়ে এই প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, যেটা আমাদের মনে উদিত হওয়া দরকার, আমাদের মনে ভাবনা আসা দরকার, সেটা হলো যে, এই শাসনব্যবস্থা, এই আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, তথাকথিত যে উন্নয়ন, এগুলো কি আমরা চোখ বুজে মেনে নিতে পারি? এই বাস্তবতাকে কি আমরা শুভেচ্ছা জানাতে পারি? আমি মনে করি, আমরা তা পারি না। সেজন্যই বাংলাদেশ সরকার তথা এদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে যা কিছু করছে সেটা কি আমরা মেনে নিতে পারি কি পারি না- এটা ভেবে দেখার জন্য আমাদের এই বাস্তবতার গভীরে যেতে হবে।

> “আমরা যদি আমাদের অধিকার নিয়ে, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, সমমর্যাদা-সমঅধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যদি বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধী হতে হবে। প্রতিবাদের জন্য, প্রতিরোধের জন্য আমাদের করণীয় কী তা গভীরভাবে দেখতে হবে, বুঝতে হবে।

আমাদের জুম্ম সমাজে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের কথাই যদি ধরি, শিক্ষিত সমাজের যারা সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী তারা সবাই শিক্ষিত, আজকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত তারাও সবাই শিক্ষিত, আজকে ছাত্রসমাজ তারাও শিক্ষিত, এই শিক্ষিত সমাজ পার্বত্য অঞ্চলের বুকে এই যে বাস্তবতা বিরাজমান, যে শাসনব্যবস্থা বিরাজমান, যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান সেটাকে তারা কীভাবে দেখেন? আমরা যদি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করি, বিষয়টি যদি আমরা নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের এই শিক্ষিত সমাজ যারা চাকরি করেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে আছেন, যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছেন, তাদের শতকরা ৮০ ভাগ এ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেতে প্রস্তুত নয় অথবা তারা নীরবতা পালন করে থাকেন। তাহলে আজকের এই যে নির্মম বাস্তবতা, পার্বত্য অঞ্চলের বুকে যে শোষণ-নিপীড়ন, যে অত্যাচার-অনাচার চলছে, জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির যে ষড়যন্ত্র চলছে সেটা কি জুম্ম জনগণের অস্তিত্বের উপর নানা দিক থেকে ক্ষুণ্ন করছে না? অবশ্যই ক্ষুণ্ন করছে।

আপনারা নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। চাকরিজীবীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আপনি আত্মজিজ্ঞাসা করুন। আপনি আপনার চাকরি এবং আপনার পরিবারের বাইরে কি কোন কিছু ভাবতে আপনি অভ্যস্ত? আজকে আপনার চতুর্দিকে যে অনাচার-অত্যাচার, যে নির্মমতা চলছে সেটা কি আপনি ভাবেন? আমি মনে করি, সেই আত্মজিজ্ঞাসা আপনি বা আপনারা করেন না। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের যে বাস্তবতা এই বাস্তবতা দাবি রাখে যে, আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে, আপনাকে সেটা বুঝতে হবে। কারণ আমরা যদি আজকের বাংলাদেশ সরকার-শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে যা কিছু করছে সেটা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে তা খুবই সুস্পষ্ট। তার পরিণতি কি তা একেবারে জলের মত পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে যে, সর্বস্বান্ত হয়ে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তিকে গ্রহণ করা। অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই যে বাস্তবতা, সে বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাবা উচিত। আজকে তাদের মধ্যে যে উচ্চাভিলাষ, যে স্বার্থবাদিতা, যে আত্মমুখীনতা বিরাজমান সেটা তার পরিবারকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার পাশাপাশি জুম্ম সমাজের অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রামকেও নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই সূত্র ধরে আমি বলতে চাই, আজকে জুম্ম সমাজের মধ্যে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছেন, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যারা বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন, সেই ছাত্রসমাজ তাদের অভিভাবকদের নির্দেশে লেখাপড়া শিখে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোন কারিগরী বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে তারা কী করবেন? তিনি হয়তো একটি চাকরির সন্ধানে থাকবেন। একটা পেশায় যুক্ত থেকে তিনি নিজের জীবনকেই শুধু দেখতে থাকবেন। একটা বিশেষ সংকীর্ণতার মধ্যে তিনি তাঁর জীবনকে নিয়ে ভাবতে থাকবেন। সেটা কি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক? কোনদিন না। এজন্যই শিক্ষিত সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল, সবচেয়ে সংগ্রামী, সবচেয়ে অগ্রণী অংশ হিসেবে এই ছাত্র সমাজকে ভাবতে হবে তার অবস্থানকে, তার পরিবারের অবস্থানকে, তার স্বজাতির অবস্থানকে তথা পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। আজকে আমরা দেখি যে, এখানে তাদের মধ্যে নানা ধরনের বক্তব্য, নানা ধরনের কথাবার্তা, নানা ধরনের আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিত সমাজ, ছাত্রসমাজের মধ্যে জীবনের যে উচ্চাভিলাষ সেটাই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু আপনার বা আপনাদের সেই উচ্চাভিলাষটাই যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তাহলে আপনার জীবন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে না, আপনি আপনার অস্তিত্বকে হারাবেন, আপনি আপনার জীবনকে যেভাবে পেতে চাচ্ছেন সেভাবে আপনি পাবেন না।

এই বাস্তবতায় এই প্রশ্নটা আসছে যে, সরকার-শাসকগোষ্ঠী যেভাবে পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে তার তথাকথিত শাসনব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা করছে সেটা কি আমরা মেনে নেবো নাকি মেনে নেব না? আমরা যদি মেনে নিই, এটা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের অস্তিত্ব আর থাকবে না। আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে আমাদের অস্তিত্বকে হারাবো। সেটা আমার প্রজন্মে না হলেও আমার সন্তান-সন্ততি বা বংশের ভবিষ্যত প্রজন্মে বা এই প্রজন্মে না হলেও পরবর্তী, পরবর্তী না হলেও তার পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যাবে সেই জুম্ম জাতি তার অস্তিত্বকে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সর্বস্বান্ত তো আমরা হতে পারি না! এই পার্বত্য অঞ্চল জুম্ম জনগণের পূর্ব পুরুষেরা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সাথে লড়াই করে আবাদ করেছিলো। আবাদ করে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করেছিল। সেই পাহাড়, পর্বত, ঝর্ণা, অরণ্য, সবকিছু আজকে বলা যেতে পারে আমাদের হাতে থাকবে না, আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

আজকে আমরা শিল্পকলা একাডেমিতে বক্তব্য রাখছি, এই বক্তব্য রাখার পশ্চাতে যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে সেই ইচ্ছা অর্জনের ক্ষেত্রে চতুর্দিকে আমরা তার প্রতিবন্ধকতা দেখি। এখানে মুখ খুলে, বুক ফুলে কিছু করার নাই। চতুর্দিকে আমাদের উপর চেপে বসে আছে সেই উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী বাংলাদেশ সরকার-শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ-নিপীড়ন। আজকে সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হলে, সমাগত সংগ্রামী সমাবেশ, সংগ্রামী সুধীবৃন্দ, আমি বলতে চাই, তাহলে আজকে আমাদের করণীয় কী সেটা ভাবতে হবে। আমরা যদি এই বাস্তবতা মেনে না নিতে পারি। যদি মেনে নিই তো তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে আমাদের অস্তিত্ব চিরতরে হারাবো। সেটা আমরা নিশ্চয় কেউই চাই না। বাংলাদেশের সরকার-শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাস্তবতা এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে তার ফলে আজকে আমরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। যে পার্বত্য অঞ্চলে দেশভাগের সময় ২.৫০ ভাগ বাংলা ভাষাভাষী ছিল, বাকী ৯৭.৫ ভাগ আমরাই ছিলাম। আজকে সেই পার্বত্য অঞ্চলে আমরাই সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। আর অনতিবিলম্বে আমাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

এই বাস্তবতায় আমরা কীভাবে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু রক্ষা করতে পারবো? সেজন্যই এই পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সংগ্রাম করেছিল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে তাদের জীবনধারাকে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। পাকিস্তান আমলেও আমাদের সংগ্রাম ছিলো। আজকে বাংলাদেশের জন্মলগ্নে মুক্তিযুদ্ধে এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের বিরাট অবদান রয়েছে। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে আজকে আমাদের অস্তিত্বের জন্য, অধিকারের জন্য আমাদের অব্যাহতভাবে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। দীর্ঘ ২০ বছরেরও অধিক দিন ধরে এখানে সশস্ত্র সংগ্রাম আমরা দেখেছি। যদিও সেটা এই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, বিশেষ অধিকার পাওয়ার জন্য সেই সংগ্রাম। সেই পরিণতিতে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। সেই চুক্তিতে যা কিছু বলা আছে বাংলাদেশ সরকার সেগুলো বাস্তবায়নে আজকে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত। এজন্য আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে আছে।

বর্তমানে এই চুক্তির বিষয়টা বাংলাদেশ সরকার-শাসকগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা হতে পারে না। সেটা হতে দেওয়া যায় না। এজন্য এই বাস্তবতাকে যদি আমরা মেনে না পারি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সংগ্রামী হতে হবে, আরও আরও অধিকতর আন্দোলন-সংগ্রামে সামিল হয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে আরও আরও অধিকতরভাবে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং জীবনকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করতে হবে। আজকে চাকরি করে যারা নিজের জীবনকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চান তাদের মতো হলে চলবে না। সেখানে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের এই অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করতে হবে, নিজেকে আরও আরও বেশি পরিমাণে উজ্জীবিত করতে হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সমাজ শ্রেণি বিভক্ত। সব শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলন-সংগ্রামে আসতে পারে না, আসবেও না। যেমন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের যারা চেয়ারম্যান-সদস্য আছেন, তাদের ভূমিকাই যদি আমরা বলি, সেভাবেই যদি আমরা ভাবি, তাহলে তো আমাদের আর বেশি দিন লাগবে না আমাদের অস্তিত্বকে হারাতে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য যতটুকু লড়াই করার বাস্তবতা আছে সেটাও থাকবে না। এখানে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য অনেকেই আছেন আমাদের পাহাড়িদের মধ্যে, জুম্মদের মধ্যে যারা সবকিছু জলাঞ্জলি

দিয়ে তারা নিজের স্বার্থ পূরণ করে থাকে। সেই সংখ্যাটা যদিও নগণ্য বলে আমরা মনে করি, কিন্তু গোটা পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম সমাজে প্রতিটি জুম্ম জাতির মধ্যে একটা অংশ আছে যারা প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, সরকার-শাসকগোষ্ঠীর সাথে আঁতাত করে, দালালি করে নিজের স্বার্থ পূরণ করে। আজকে যেমন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে যা কিছু কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে সেখানে আমরা কী প্রত্যক্ষ করি? প্রত্যক্ষ করি যে, সবকিছুই আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেম্বার-চেয়ারম্যান হয়েও তারা আবার পার্বত্য জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। এই বাস্তবতার আলোকে পার্বত্য জেলা পষিদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদেরকে প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, প্রতিবাদ করতেও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত কেন? আমরা এই যে অবস্থায় আছি, এই যে স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা, এখান থেকে যদি বেরিয়ে আসতে না পারি তাহলে পার্বত্য জেলা পরিষদ যেভাবে প্রতিদিন চুক্তি বিরোধী, জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কাজগুলো করে যাচ্ছে, ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারের কার্যালয় তথা গোটা পার্বত্য অঞ্চলের শাসনের ক্ষেত্রে যারা যুক্ত আছেন তাদের যে কার্যক্রম সেই ধ্বংসাত্মক কাজগুলো যদি আমরা মুখ বুজে সহ্য করে যাবো? সেগুলো যদি মেনে নিয়ে থাকি তাহলে কি হবে? তাহলে বেশি সময় লাগবে না যে, আমাদের যে অস্তিত্ব সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের এখনও সময় আছে। আমাদের অধিকার আদায়ের, চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই-সংগ্রাম করার বাস্তবতা এখনও আমরা খুঁজে পাই। সেজন্য এই সমাবেশে সুধী সমাজের কাছে, পার্বত্য অঞ্চলের যুব সমাজের কাছে যে বিষয়টা তুলতে চাই সেটা হচ্ছে, সরকার বা শাসকগোষ্ঠী যা করে চলেছে সেটা কি আমরা মেনে নেবো নাকি মেনে নেবো না? যদি মেনে নিই তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে চিরতরে আমাদের অস্তিত্ব হারাতে হবে। এটাই বাস্তবতা। সুতরাং আমরা যদি আমাদের অধিকার নিয়ে, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, সমমর্যাদা-সমঅধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যদি বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধী হতে হবে। প্রতিবাদের জন্য, প্রতিরোধের জন্য আমাদের করণীয় কী তা গভীরভাবে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। এই কারণেই আমাদের একটা ঐকমত্যের বাস্তবতার জন্ম দিতে হবে যে, আমরা জুম্ম স্বার্থ বিরোধী বাস্তবতা মানতে পারি না, আমরা মেনে নেব না।

সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলের সংগ্রামী নাগরিক সমাজকে, সংগ্রামী ছাত্র-যুব সমাজকে, সংগ্রামী জনগণকে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামকে উজ্জীবিত করতে হবে, আরও জোরদার করতে হবে, যাতে এই চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সরকার এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সেই বাধ্যবাধকতা পর্যন্ত এই দেশের সরকার-শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে আমাদের বর্তমানে যে অবস্থা, প্রতিদিন যে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের যে দুর্বিষহ জীবন, বুকের যে কত যন্ত্রণা, কত জ্বালা, তা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। যারা এই অধিকারের ক্ষেত্রে, মর্যাদা বা সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে বা পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা সচেতন আমরা সেটা বুঝি, আমরা অনুভব করি। এজন্যই আমি বলতে চাই, আমরা কেন নীরবে সবকিছু মেনে নেবো? আমরা মেনে নিতে পারি না, মেনে নেওয়া উচিত না। এজন্য আমি আজকের এই মহান নেতা এন এন লারমার জন্মদিবসে তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে আমি বলতে চাই যে, তিনি চেয়েছিলেন এই পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম সমাজ মাথা উঁচু করে, সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর বুকে মানসম্মান ও মর্যাদা নিয়ে নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সেই স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

সেই বাহাত্তরের বা তারও আগে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে, যে বাঁধের মাধ্যমে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, আমাদের সমস্ত জীবনধারাকে আঘাত করা হয়েছে এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে নতুন করে যে বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে '৪৭-এর নীলনকশা বাস্তবায়ন আরও সহজতর হয়েছে, তার বিরুদ্ধে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যুব বয়সে প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে তাঁকে জেলে অন্তরীণ হতে হয়েছে। সরকার তাঁর উপর যা যা আইনী উপায় আছে সেভাবে তাঁকে দমন-পীড়ন করতে চেয়েছিল। আজকে সেই এম এন লারমা, সেই মুক্তিকামী-অধিকারকামী এম এন লারমার যে স্বপ্ন তিনি নতুন করে দেখাতে চেয়েছিলেন ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন কালে এবং প্রথম জাতীয় সংসদে সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন, প্রদর্শন করেছেন, উজ্জীবিত হতে জুম্ম জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ, তাঁর প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, পার্বত্য অঞ্চলের বুকে জুম্ম জাতীয়তাবাদের চেতনা দেখিয়েছিলেন এবং যার পথ ধরে আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে এই অস্তিত্ব সংরক্ষণের লড়াই-সংগ্রাম এগিয়ে যাচ্ছে, এম এন লারমার সেই চেতনা আমাদের মাঝে রয়েছে। তাঁর সেই স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরেই আজকের এই সমাবেশে আমার এতটুকু কথা বলা।

আমি কাছে থেকে এম এন লারমাকে দেখেছি। তিনি আমার সহোদর ভাই হিসেবে যত না পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি একজন রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে। তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম, তাঁর জীবনধারা এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা সেটা আমরা ভুলে যেতে পারি না। আমরা ভুলে যাইনি, ভুলে যাবো না। এজন্য আমি মনে করি, আজকে প্রতিটি জুম্ম নরনারীকে এম এন লারমার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, তাঁর জুম্ম জনগণকে নিয়ে তথা সমগ্র মানবজাতি, নিপীড়িত-নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে, গরীব মানুষের স্বাধিকার-অধিকার নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নকে সামনে রেখে জুম্ম জনগণকে আরো আরো সংগ্রামী, প্রতিরোধী, প্রতিবাদী হতে হবে। সেই প্রতিবাদ, সেই প্রতিরোধ আমাদের অস্তিত্বকে সমুন্নত করবে, করতে পারে– এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমাদের অধিকতর আন্দোলনে, উচ্চতর আন্দোলনে, আমাদের যখন যে আন্দোলন দরকার সেই আন্দোলনে সামিল হতে আমাদের এগিয়ে থাকতে হবে- এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

এম এন লারমা ছিলেন বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার নেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়

॥ রাজা দেবাশীষ রায়॥

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ও মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেলের চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। আলোচনা সভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য নিম্নে পত্রস্থ করা হলো – তথ্য ও প্রচার বিভাগ

আমি আজকে যা বলবো তা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মতামত, একজন চাকমা হিসেবে, একজন পাহাড়ি হিসেবে, একজন আদিবাসী হিসেবে, একজন জুম্ম হিসেবে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে। আমার বক্তব্যের সাথে চাকমা সার্কেলসহ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব ও নেতার বিষয়ে বলা মোটেই সহজ নয়। প্রথমত এম এন লারমার জীবনালেখ্যের বিষয়ে আমার জানা ও বোঝার মধ্যে এখনও অনেক বড় ফাঁক রয়ে গেছে। আজকের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অভিজ্ঞজনের বক্তব্য থেকে আমি শিখেছি। বিগত এম এন লারমা অনুষ্ঠান থেকেও শিখেছি। এখনও সেই শেখাজানা শেষ হয়নি। দ্বিতীয়ত আমি যাকে নিয়ে কথা বলছি, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার নেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়। এই প্রমাণ আমরা পাই সমাজতন্ত্রবাদী একাধিক জাতীয় পর্যায়ের নেতা, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মীর বক্তব্য ও লেখালেখি থেকে। অনেকেই তাঁকে আদর্শ নেতা ও কর্মী হিসেবে অভিহিত করেন, মান্য করেন ও অনুসরণ করেন। তাঁর নৈতিক চরিত্র, তাঁর জীবনাচার, তাঁর বিলাসবিহীন অভ্যাস এবং সৎ সাহসের জন্য। প্রমোদ বিকাশ কার্বারী, যিনি সাহিত্য জগতে 'ফেলাযেয়্যা' নামে পরিচিত, তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন এম এন লারমার ব্যাপারে। তাঁদের মামা-ভাগ্নে

সম্পর্ক, একে অপরকে 'মাম' বলে সম্বোধন করতেন। এম এন লারমা তাঁকে একবার বলেছিলেন, তাঁর নীতি-আদর্শ ও সংগ্রামের ব্যাপারে–'গদ্দনাবো বেলেত্তোই ঘুজিলেও ত-মাম্মো কনদিন ন-খেমিবো'– এই কথাটা বলেছিলেন, অর্থাৎ ব্লেড দিয়ে গলা কেটে দিলেও তিনি তাঁর নীতি-আদর্শ, বিশ্বাস, সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াবেন না। আরেকটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে তিনি ছিলেন একজন নীতিনির্ধারক। 'আমি বাঙালি নই, আমি চাকমা'– এটা বলে তিনি গণপরিষদে এবং জাতীয় সংসদে যে বক্তব্যগুলো রেখেছিলেন এবং যে আইনী প্রস্তাবাবলী পেশ করেছিলেন তাতে অন্তর্নিহিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-আদিবাসী জাতিসমূহের সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তা এবং একটি বহুমাত্রিক, বহু সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম তাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ।

৭৪ সনে, আমি গত বছরও বোধ হয় বলেছি, আমি যখন এসএসসি পরীক্ষার জন্য ফরম ফিলাপ করছিলাম তখন সংবিধানে লেখা ছিল– 'বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাঙালি'। আমি তা লেখতে রাজি ছিলাম না। আমরা রাঙ্গামাটি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে যারা সেবছর ফরম ফিলাপ করেছি, আমার জানামতে যারা পাহাড়ি বা জুম্ম আমরা একজনও 'বাঙালি' লিখিনি। আমাদের শিক্ষক আমাদেরকে বললেন, 'ফরম ফিলাম যদি না হয়, যদি তোমরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পার, তার জন্য আমি দায়ী থাকবো না।' কিন্তু আমরা সেটা মানতে নারাজ ছিলাম এবং আমরা বাংলাদেশিই লিখেছি এবং আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, এসএসসি পাশ করেছি। তখন যদিও বা আমার কৈশোর বয়স, তখন থেকে আমি তাঁর নীতি-আদর্শকে, তাঁর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতাম। রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরেও তাঁর মানবতাবোধ, প্রতিবেশবান্ধবতা, নারীবান্ধবতা এবং পতিতালয়ের যৌনকর্মীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে আমরা স্মরণ

করি। মেহনতি মানুষের অধিকারের পক্ষে তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল উদ্যোগ বাংলাদেশের সংসদসহ রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিল বিরল। দেশের ভেতরে ও বাইরে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবাধিকার, আদিবাসী অধিকার, উন্নয়ন, পরিবেশ নিয়ে আমি দু'যুগ ধরে জড়িত ছিলাম। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে জাতীয়-আন্তর্জাতিক আইন, সনদ, চুক্তি ইত্যাদির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে আমার সুযোগ হয় অংশগ্রহণ করার। সেই দিক থেকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে বর্তমানে আদিবাসী অধিকারের জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে আন্দোলন চলছে, এম এন লারমা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্দোলন করেছেন তার সাথে হুবহু না হলেও অনেকাংশে মিল আছে। এতে আমার যে উপলব্ধি হয়েছে, তা হলো- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মসহ পৃথিবীর আদিবাসী জাতি ও তার জনমানুষের এবং মেহনতি মানুষের বর্তমান কট্টর পুঁজিবাদী ধারার তথাকথিত গণতন্ত্রের কাঠামো ও প্রক্রিয়াতে মুক্তির পথ সুগম নয়।

বাংলাদেশের গণপরিষদ ও তৎপরবর্তী জাতীয় সংসদে ১৩ অক্টোবর ১৯৭২ থেকে ২১ নভেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত এম এন লারমার বক্তব্যের সহজ-সরল পঠন থেকেই আমরা তাঁর সমাজতন্ত্রবাদী মতাদর্শের পরিষ্কার ধারণা পাই। এতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। আইনগতভাবেও আইনসভাতে তাঁর বক্তব্যের নাড়িভুড়িতে জুড়ে রয়েছে মানবাধিকারের কথা যা বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষায় 'মৌলিক অধিকার' ও 'মৌলিক স্বাধীনতা'। তিনি আইনসভাতেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, স্বৈরাচারী আয়ুব সরকারের ন্যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকারও বাক স্বাধীনতা, সংগঠন করার অধিকার, সমাবেশ ও জনসভা করার অধিকার একদিন ভূলুণ্ঠিত করতে পারে। এই সংশয় এখন সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তো বটেই।

দেশের মালিকানা নীতির ব্যাপারে তিনি আইনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। প্রত্যক্ষভাবে না বলে থাকলেও, আমার মনে হয় তিনি সামষ্টিক ও সমষ্টিগত ভূমি ও সম্পদের অধিকারের অস্বীকৃতির বিষয়ে তাঁর সংশয়ের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ বর্তমান বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানে ব্যক্তিগত অধিকার, সমবায়ের অধিকার ইত্যাদি মালিকানার কথা রয়েছে। কিন্তু সামষ্টিক অধিকার সংবিধানে ৭২-এও স্বীকৃত ছিল না, এখনও নেই। আমি মনে করি, সেই ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে তৎকালে যে দ্বিপাক্ষিক স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, তখনকার মানবাধিকারের অঙ্গনে সামষ্টিক অধিকারের ধারণার অবির্ভাব হয়ে থাকলেও তার প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে নানা রকমের বাধানিষেধ ছিল; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ এম এন লারমা যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি আদিবাসী অধিকারের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্লাটফরম থেকে জুম্ম ও অন্যান্য আদিবাসীদের অধিকারের জন্য লড়ে যেতেন এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে যেতেন।

এম এন লারমা মার্কসবাদের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন এবং লেনিনবাদ ও মাওবাদ দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে এই অঙ্গনে আমার কিছুটা বিচরণ ছিল। ক্ল্যাসিকেল মার্কসবাদে যে বিশ্বাস রয়েছে যে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারণে আন্দোলন হবে এবং শ্রেণিবৈষম্যের ডাইনামিক্স এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে শাসকগোষ্ঠীর পতন এবং অবশেষে সমাজের বিবর্তনের ফলে শ্রেণিহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সুবাদে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবত ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রকে ডিকটেটরশীপ অব দ্য প্রোলেতারিয়েত হিসেবে সম্বোধন করতো। শ্রেণি সংগ্রাম হতে পারে, শ্রেণিদ্বন্দ্ব থাকবে এবং পুঁজিবাদীর বৈপরিত্য ও নৈতিক শূন্যতা– এটাও আমি মানি। মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখার পর এক শতাধিক বৎসরের বিশ্ব ইতিহাসে তাই সাক্ষ্য দেয়।

এখন এম এন লারমার নীতি-আদর্শকে আমরা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের সাথে যদি আমি কমিউনিজমের একটা তুলনা করি, কমিউনিজমের সেই রাষ্ট্রহীন-শ্রেণিহীন ব্যবস্থা ও বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ কিছুটা কাছাকাছি। কিন্তু বিশ্বে, সমাজে এখনো এই দুটো বিষয় রয়ে গেছে সোনার হরিণের মতো। তবে নীতিগত দিক থেকে মার্কসবাদের চেয়ে মানবিক রাজনৈতিক তত্ত্ব আমার জানা মতে এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। বর্তমান পুঁজিবাদী ও মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় সত্যিকার গণতন্ত্র তো নেইই।

নেতা মানবেন্দ্র লারমার জীবনাচারের আরো অনেক দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারি। যথা– তাঁর প্রতিবেশবান্ধবতা, বন্যপ্রাণী, বন ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও মৈত্রী। এ বিষয়ে এম এন লারমা স্মারকগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর দলের এক সহকর্মী লিখেছিলেন, হেডকোয়ার্টারে তারা যখন ছিলেন (সম্ভবত তারা তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন), তখন সেই হেডকোয়ার্টারের আশেপাশে বনের কথা, ছড়ার কথা, প্রতিবেশের কথা এবং জীবজন্তুদের না মারার জন্য উনি সহযোদ্ধাদের বলতেন। কেউ কেউ হয়তো এম এন লারমার মানবতাবোধ, প্রতিবেশ ও প্রাণজগতের প্রতি এই অহিংসাকে বৌদ্ধ দর্শন ও আদিবাসী আধ্যাত্মিকতার সাথে মিল দেখতে পাবেন। এতে তাঁর পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের প্রভাব যে নেই তা বলা মুশকিল। এম এন লারমার পিতা-মাতা চিত্ত কিশোর চাকমা ও সুভাষিণী দেওয়ানের প্রভাব নিশ্চয়ই তাঁর চরিত্রের বিকাশে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে, এবং তাঁর গ্রামবাসী তৎকালীন মাগুরুমের চাকমা সমাজের প্রভাবও নিশ্চয় আছে। তাঁর পিতার জীবনের শেষ দিকে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কাটিয়েছিলেন বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে। আমার বাসস্থান রাঙ্গামাটির রাজবাড়ি দ্বীপের রাজবিহারে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে মাগুরুমে তাঁর সমাধিস্থলতুল্য একটি বিহার রয়েছে, যা ছিল লারমা পরিবারের আদি আবাসস্থল।

এম এন লারমার দার্শনিক মতবাদকে আমি থাইল্যান্ডের একজন দার্শনিক এবং রাজনৈতিক কর্মী সুলাক শিবরক্ষার সাথে অনেক মিল খুঁজে পাই। আচার্য সুলাক-এর ব্যাপারে তাঁর অনুসারী ও ভক্তরা তাঁকে বলেন তিনি নাকি বৌদ্ধ-সমাজতন্ত্রী-প্রতিবেশবাদী-নারী অধিকার কর্মী, সব দর্শন মিলেই। বাস্তব জীবনে সাদা পোশাক পড়া হাস্যোজ্জ্বল এম এন লারমার সাথে আমার তিন-চারবার দেখা হয়েছে। সব শেষ দেখা সম্ভবত কাপ্তাইয়ে, শ্রীলঙ্কা অথবা ভারত থেকে আসা এক বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে দেয়া এক নৈশভোজে। তখন তার সহযোগী ছিলেন তৎকালীন সংসদ সদস্য চাইথোয়াই রোয়াজা।

এম এন লারমা আমাদের জন্য একটি রোল মডেল। ১৯৬১-৬২-তে আয়ুব খানের সামরিক শাসন শেষ হয়ে যায়। তার আগ পর্যন্ত মার্শাল ল ছিল। এম এন লারমাকে চট্টগ্রামের বাণ্ডেল রোডের হোস্টেল থেকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনও মার্শাল ল ছিলো কি নাই তা আমি নিশ্চিত নই। তখন ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল্‌স নামে এক বিধি ছিল। সেটার অধীনে গোয়েন্দারা, ডিআইবিরা সবসময় তাঁর আচরণ, গতিবিধি লক্ষ্য করতো। তাঁর কার্যক্রমকে 'কমিউনিষ্ট' ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত করে তাঁকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। যে কাপ্তাই বাঁধ সবাইকে ডুবিয়ে ভূমিহীন বানালো, চাকমাসহ বিভিন্ন জাতির একসঙ্গে বসবাসের যে একটা সামষ্টিক আত্মা ছিলো তাতে আঘাত দিলো তার বিরুদ্ধে তিনি লিফলেট বিতরণে সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যদিও তখন কেবল কিছু যুব ও ছাত্র ছাড়া বাকীরা সাহস করেননি সেই আন্দোলনে সামিল হতে। দু'বছর জেলে থাকার পর উনি বেরিয়ে এলেন। তারপর উনি বিএ পাশ করলেন, এলএলবি পাশ করলেন।

এছাড়া ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মত ব্যক্তিত্বের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের স্বায়ত্তশাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত এলাকা' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তিনি মেহনতি মানুষের অধিকারের বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করতেন। বঙ্গবন্ধুর মত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তৎকালীন জাতীয় সংসদে সাহসিকতার সাথে কথা বলার মতো বুকের পাটা কয়জনের ছিল তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ ছিল বিরল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ যখন তিনি বঙ্গবন্ধুকে চার দফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা পেশ করেছিলেন, এতে ছিল ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের কথা, উপজাতীয় প্রধানদের দপ্তর সংরক্ষণের কথা, আইন পরিষদসহ স্বায়ত্তশাসনের কথা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভবত তিনিই প্রথম আইনজীবী বা এডভোকেট। সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল। গণপরিষদ ও আইনসভায় সাংবিধানিক আইনের উপর তাঁর অনেক আলোচনা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা ও প্রশাসনিক মর্যাদার বিষয়ে, ভারত শাসন আইন ১৯৩৫, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান, ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধান ইত্যাদির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিলো।

২০১১ সনে যখন সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সরকার আলোচনা শুরু করে। তৎকালীন আদিবাসী সংসদ সদস্যদের অনুরোধে একটি কমিটিতে আমি নেতৃত্ব প্রদান করি, সাংবিধানিক সংস্কারে আদিবাসী অধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সেই কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নেতা গৌতম কুমার চাকমা, আজকে উপস্থিত মঙ্গল কুমার চাকমা ও সঞ্জীব দ্রং ছিলেন। আমরা যখন প্রস্তাব প্রণয়ন করি, সে সময় আমরা বাহাত্তরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক প্লাটফরম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অধিকারকে তুলে ধরেছিলেন, তার আলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন ভাষায় প্রতিফলন করতে আমরা চেষ্টা করেছি। সেই প্রস্তাবাবলীর সামান্য অংশ সংবিধানের ২০১১-এর সংশোধনীতে এসেছে। সেটা হলো নতুন ২ক অনুচ্ছেদে 'প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এর সাথে 'তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন' মর্মে সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মৌলিকভাবে আমাদের দাবিনামাগুলো সংশোধনীতে আসে নাই। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন আবারও সাংবিধানিক পরিবর্তনের সুযোগ আসে, তখন আমাদের একইভাবে চলে যেতে হবে সেই ১৯৭২ সালে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রস্তাবাবলীতে, যেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি দেখেছিলেন। উনি উনার আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে, উপলব্ধি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-কে রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং ১৯০০ সনের রেগুলেশনকে তিনি কেবল ডিসি বা সরকারের অতিক্ষমতা বা অপকৌশল বা অপপ্রশাসন বলে দেখেননি। এতে তিনি জুম্মদের স্বকীয়তা ও বিশেষ আবাসভূমির ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

২০১৭ সনে যখন সুপ্রিম কোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের মামলার অন্তিম শুনানি গৃহীত হয় এবং অবশেষে রায় প্রদান করা হয়, তখন এই রায়ে আপিল বিভাগ বলেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন প্রণীত হওয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই অঞ্চলের আদিবাসীদের সত্তা ও অধিকারকে সংরক্ষণ করা এবং এ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, এই রেগুলেশন সংবিধান পরিপন্থী নয়। এই রেগুলেশনের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বিশেষ প্রশাসনিক ও আইনগত মর্যাদা রয়েছে, যদিও সংবিধানে প্রত্যক্ষভাবে সেটা লেখা নেই। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে হলেও সেটার একটা সাংবিধানিক মর্যাদা রয়েছে। রায়ে এমনও বলা হয়েছে যে, এই রেগুলেশনের মূল স্পিরিটের পরিপন্থী কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োগ করা হলে সেটা আইন বিরোধী এবং সংবিধান বিরোধী হবে। আগামী ১৭ অক্টোবর আঞ্চলিক পরিষদের সাংবিধানিক বৈধতা ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর কিছু ধারার বৈধতার উপর শুনানী হবে আপিল বিভাগে। জানি না কী হবে সেখানে। আজকের নেতা জেবি লারমা মহোদয়ের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি এই মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছে, চাকমা সার্কেলও পক্ষভুক্ত হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে, আইন-আদালতেও আমাদের লড়ে যেতে হবে আমাদের অধিকারের জন্য।

সে যাই হোক, এম এন লারমার আদর্শকে ধরে রাখতে হলে তাঁর মতবাদ ও জীবনাচার থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের প্রেক্ষাপট অনুসারে আমাদের সংগ্রামে এগুতে হবে। এতে কৌশলী হতে হবে অবশ্যই এবং এখানে আমাদের যে সহিংসতা চলছে এটা আমাদের পরিহার করতে হবে। এম এন লারমার সেই কৌশলগুলো আমাদের অবলম্বন করতে হবে। আমি আজকে এই বিশেষ দিনে এম এন লারমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আজকের আয়োজক সংগঠনের সদস্যদেরকে এই উদ্যোগের জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য, এবং কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বিশেষ দিন উদযাপন সফল হোক এবং এম এন লারমার স্মৃতি ও আদর্শ দীর্ঘজীবী হোক।

এম এন লারমার সংসদীয় সংগ্রামের কিছু অনালোচিত পাঠ ও বর্তমান বাস্তবতা

।। মঙ্গল কুমার চাকমা।।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে তাঁর দূরদর্শীসম্পন্ন, নির্ভীক ও প্রাজ্ঞ সংসদীয় সংগ্রাম। তাঁর সংসদীয় সংগ্রামের অনেক দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। তবুও তাঁর সংসদীয় জীবন ও সংগ্রামের বিশ্লেষণের অন্ত নেই। বস্তুত তাঁর সংসদীয় জীবন শুরু হয় ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস জয় হলে 'পরে পাকিস্তানের তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেই নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নেয়নি এবং আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি, সেহেতু প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হিসেবে সে সময় এম এন লারমার পার্লামেন্টারি জীবন বাস্তবিকভাবে শুরু হয়নি বলে বলা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তাঁর সংসদীয় সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত গণপরিষদের অধিবেশন শুরুর মধ্য দিয়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ গঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১৬২টি আসন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০টি। সেসব আসনের মধ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬০টি আসনে ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় পরিষদের অপর দুইটি আসনে স্বতন্ত্র সদস্য যথাক্রমে তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদীব রায় (পার্বত্য চট্টগ্রাম আসন থেকে) এবং ন্যাপের এ্যাডভোকেট সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত নির্বাচিত হন। আর প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এম এন লারমা ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে সাবেক বোমাং রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরী মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত উল্লেখিত ৪৬৯ জন সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয়েছে ৪০৪ জন সদস্য নিয়ে (অপর সদস্যদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করেন, অনেকে আওয়ামীলীগ থেকে বহিষ্কৃত হন বা পাক বাহিনীর পক্ষ নিয়ে দুই/একজন পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন)। গণপরিষদের ৪০৪ জন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এম এন লারমা। আর ছিলেন ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। গণপরিষদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা।

> "সংবিধানে দেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মাঝিমাল্লা- কামার-কুমার-জেলে-তাঁতী-পতিতাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর গভীর স্বপ্ন ও ভাবনা, দেশরক্ষা ও ডিফেন্স বাজেট, পবিত্র কোরান পাঠের পাশাপাশি গীতা-ত্রিপিটক-বাইবেল পাঠের দাবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা আঙ্গিকে অনেক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ১৯৭২ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন জারি করে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। বস্তুত তখন থেকেই এম এন লারমার সংসদীয় জীবন শুরু হয় বলে বলা যেতে পারে। এরপর সদ্য প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সমর্থনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে এম এন লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে চাইথোয়াই রোয়াজা স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই প্রথম জাতীয় সংসদ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সপরিবারে হত্যা করা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। বলা যায় ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিল এম এন লারমার সংসদীয় জীবন। এম এন লারমার সংসদীয় জীবনের মেয়াদ মাত্র সাড়ে তিন বছর হলেও তার তাৎপর্য ছিল ব্যাপক ও অসীম। এম এন লারমার সংসদীয় বিতর্ক গণপরিষদ এবং প্রথম জাতীয় সংসদের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাস খুঁজতে গেলে উইকিপিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডারে এম এন লারমার নাম ঘুরেফিরে উঠে আসে। সেসব ইতিহাসে এম এন লারমার সংসদীয় বিতর্কগুলো নানাভাবে উদ্ধৃত থাকে।

এম এন লারমার সংসদীয় সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের চারদফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সংবিধানে জুম্মদেরকে বাঙালি হিসেবে

আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ওয়াকআউট করা, সংবিধান বিলে স্বাক্ষর না করা ও বাঙালি হিসেবে পরিচয় না দেয়া, সংবিধানে দেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মাঝিমাল্লা- কামার-কুমার-জেলে-তাঁতী-পতিতাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর গভীর স্বপ্ন ও ভাবনা, দেশরক্ষা ও ডিফেন্স বাজেট, পবিত্র কোরান পাঠের পাশাপাশি গীতা-ত্রিপিটক-বাইবেল পাঠের দাবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা আঙ্গিকে অনেক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এম এন লারমার সংসদীয় জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে জানা অনেক বাকি রয়েছে বলে বলা যেতে পারে। তৎকালীন আওয়ামী লীগের একাধিপত্য গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে একা যেভাবে অকুতোভয় চিত্তে সরকারের গণবিরোধী ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এবং বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন সে বিষয়ে আরো গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়। জাতীয় সংসদে তিনি জাতীয়-স্থানীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, যেগুলোর মধ্যে এখনো অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনালোচিত রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তেল-গ্যাস। এই তেল-গ্যাস বিষয়ে এম এন লারমার চিন্তাভাবনা ও মতামত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূল্যবান খনিজ সম্পদ সম্পর্কে এম এন লারমা জাতীয় সংসদে আলোকপাত করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম বিল, ১৯৭৪' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এসব গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য তিনি জোরালো মতামত রেখেছিলেন। 'পেট্রোলিয়ামের আহরণ, উন্নয়ন, কাজে লাগানো, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বিধিবিধান-প্রণয়নকল্পে আনীত বিলটিকে ১৯৭৪ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হোক' মর্মে এম এন লারমা জাতীয় সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব সে সময় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পেট্রোলের জন্য আজকে সারা বিশ্বে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। সেই পেট্রোল যদি আমাদের দেশে পাওয়া যায়, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে না নিয়ে যদি আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতির পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তাহলে সেটা আমাদের সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। এটা করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না।' এজন্য তিনি আপামর দেশবাসীর মতামত গ্রহণের নিমিত্তে জনমত যাচাইয়ের জন্য অধিকতর প্রচারের প্রস্তাব করেছিলেন।

এম এন লারমা দেশের তেল-গ্যাস প্রভৃতি মূল্যবান জ্বালানী সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে কতটা জরুরি তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, যা তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। দেশের তেল-গ্যাস হচ্ছে জাতীয় সম্পদ, জনগণের সম্পদ। এ সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করতে হবে বলে তিনি জোরালো অভিমত দিয়েছিলেন। কোনক্রমেই এই জাতীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে লুন্ঠন করতে দেয়া যায় না বলে তিনি মনে করতেন। তিনি সে সময় যে আশঙ্কা করেছিলেন বর্তমানে সেসব আশঙ্কা প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানে সেই তেল-গ্যাস রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আহরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ না করে বিদেশী কোম্পানীর কাছে পানির দরে বিকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানীর কাছে যেভাবে সহজ শর্তে গ্যাস অনুসন্ধান, আহরণ, উত্তোলন ও বাজারজাতকরণের জন্য লীজ দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করলে তেল-গ্যাস নিয়ে এম এন লারমা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তা আজ বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দেশে একাধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল কোম্পানির সঙ্গে পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত এবং দেশের একমাত্র তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-এর সাথে চুক্তি রয়েছে। তবে অভিযোগ রয়েছে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে নিক্ষেপ করে এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মতে, গত ১৬ জুন ২০১১ জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে নিক্ষেপ করে বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোপসাগরের দু'টো গ্যাস ব্লকের (১০ ও ১১) গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য কনোকোফিলিপস নামের একটি মার্কিন কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শুধু যে এই দু'টি ব্লকের উপর মার্কিন কোম্পানির দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয় বরং এরই পথ ধরে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের গ্যাস সম্পদের উপর মার্কিনসহ আরও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন কোম্পানির দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। এভাবে তেল-গ্যাস সম্পদ বিদেশী কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং দেশি-বিদেশি লুটেরাদের স্বার্থে একের পর এক সরকার গ্যাস-কয়লা সম্পদ পাচারের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে বলে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি অভিযোগ করেন।

এম এন লারমা যথার্থই বলেছেন যে, 'আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্ত করে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু এই ভিত্তি গড়ে তোলার মূলে এই পেট্রোল যেখানে প্রধান ভূমিকা নেবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যদি এই পেট্রোল সত্যি আমাদের দেশে পাওয়া যায়। তখন আমাদেরকে আর কোন ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না। এটা সত্যি অত্যন্ত সুখের কথা। কিন্তু পেট্রোল আহরণের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতি হয়ে যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা নয়।' সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তেল-গ্যাস রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আহরণ ও উত্তোলন না করে বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। এটা জাতীয় স্বার্থে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি আরো বলেছিলেন, 'সংবিধানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ১৯১৩ সালের সেই

কোম্পানি এ্যাক্ট, যে এ্যাক্ট দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রভুরা তাদের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য প্রবর্তন করেছিল, সেই আইন এখানে আবার কেন প্রবর্তন করা হবে?' বস্তুত এদেশের একের পর এক সরকার উপনিবেশিক ধারণা থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। উপনিবেশিক কায়দায় দেশের শাসকশ্রেণি এদেশের মানুষকে শাসন ও শোষণ করে চলেছে।

এম এন লারমার দেশের অন্যতম জাতীয় সম্পদ বিদ্যুৎ সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৩ জুলাই কর্ণফুলী উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্পর্কে জাতীয় সংসদে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, 'কর্ণফুলীতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা হলেও এর কোন আলাদা হিসাব রাখা হয় না।' বলাবাহুল্য, কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দেয়ার সময় বলা হয়েছে বাঁধে উদ্বাস্তু ও ক্ষতিগ্রস্তরা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন। কিন্তু বাস্তবে কর্ণফুলীতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাঁধে উদ্বাস্তু ও ক্ষতিগ্রস্ত কেউই পায় না। কর্ণফুলীর বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রেডে চলে যায়।

'কাপ্তাই ড্যামে জেনারেটর চালু রাখার জন্য সেখানে যে পানি রয়েছে, বর্ষাকালে সেই পানির লেভেল একশ' ফুটের উপর চলে যায়, তারপর আস্তে আস্তে সেই লেভেল কমতে কমতে কোন সময় ৯০ ফুট, কোন সময় ৮৭ ফুট, কোন সময় ৮৫ ফুট হয়ে যায়' এর কারণ সম্পর্কে তৎকালীন জ্বালানী মন্ত্রীর কাছে এম এন লারমা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, কাপ্তাই হ্রদে ডুবে যাওয়া অনেক জমি শুষ্ক মৌসুমে ভেসে উঠে, যেগুলোকে জলেভাসা জমি বলা হয়। সেই জলেভাসা জমিতে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রধানত একফসলী ধান চাষ করে থাকে। কিন্তু এটা অনেকাংশে নির্ভর করে শুষ্ক মৌসুমে পানির লেভেল কমানোর উপর বা বর্ষা কালে পানির লেভেল বাড়ানোর উপর। শুষ্ক মৌসুমে যথাসময়ে পানির লেভেল কমিয়ে দেয়া হলে কৃষকরা অনেক জমি চাষ করতে পারে। আবার বর্ষা মৌসুমে চাষকৃত ধান পাকা পর্যন্ত পানির লেভেল বাড়িয়ে না দিলে ঠিকভাবে কৃষকরা ফসল ঘরে তুলতে পারে। তার বিপরীত হলে কৃষকদের কপালে হাত দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এভাবেই জলেভাসা জমির উপর কাপ্তাই হ্রদের পাড়ে বসবাসকারী (যারা কাপ্তাই বাঁধে উদ্বাস্তু হয়েছিল) হাজার হাজার পরিবারের জীবনজীবিকা নির্ভর করে। অথচ কর্ণফুলী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ সে বিষয়টির প্রতি তেমন একটা সংবেদনশীলতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন করে যখন জেনেছিলেন যে, সে সময় 'সরকার পল্লী বিদ্যুতায়নের অংশ হিসেবে ৩০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছিল।' কিন্তু 'সেই ৩০০টি গ্রামের একটি গ্রামও পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল না' তখন এম এন লারমা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হচ্ছে সবচেয়ে বিদ্যুৎ বঞ্চিত এলাকা। এই বিদ্যুৎ-বঞ্চনা পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। সরকারের এ ধরনের অপরিকল্পিত ও বৈষম্যমূলক বিদ্যুতায়ন সংবিধান পরিপন্থী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, শাসকশ্রেণির সেই বৈষম্যমূলক, পরিবেশ বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করার একটি মহাপরিকল্পনা করেছে বর্তমান মহাজোট সরকার। কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশি একটি টিম দিয়ে কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির সহযোগিতায় এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ তৈরি করছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সরকার দেশের গ্যাস বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে দেশকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ আরও নাজুক অবস্থায় পড়বে, জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে, ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বাড়বে, ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের দামও বাড়বে বলে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আরেকটি অন্যতম সম্পদ হচ্ছে রেলওয়ে। বাংলাদেশ ছোট হলেও জনসংখ্যা বিরাট। ১৬ কোটি মানুষের পরিবহন ও মালামাল পরিবহনের জন্য সড়ক ও জলপথের পাশাপাশি রেল পথ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন খাত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে রেলওয়ের অবদান অনস্বীকার্য। অথচ আজকে সেই রেলওয়ে চলছে ধুঁকে ধুঁকে। রাষ্ট্রীয় তহবিলের অন্যতম লোকসানী খাত হিসেবে পরিণত হয়েছে। রেলওয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পরিবর্তে দিন দিন রেল লাইন ও রেলের বগি ক্ষয় হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। টেকসই ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব, দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের আজকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই রেলওয়ে খাতকে উন্নয়নের জন্য এম এন লারমা তৎসময়ে জাতীয় সংসদে বার বার তুলে ধরেছিলেন।

১৯৭৪ সালের ১৬ জুলাই রেলওয়ের ব্যয় বরাদ্দের দাবি মঞ্জুর সম্পর্কে এম এন লারমা বলেছিলেন যে, 'রেলওয়ের সব কিছুর উন্নতির মূলে হল সাধারণ ব্যবস্থাপনা। ...সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর দেশের এই বৃহত্তম যোগাযোগ-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল। বাংলাদেশের এত বড় যোগাযোগ-ব্যবস্থার সাফল্য যাদের মস্তিষ্ক এবং দরদের উপর নির্ভর করে, বিচার করে দেখতে হবে, মাননীয় স্পিকার, স্যার, তারা কতটুকু দরদ এবং সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করেছেন। সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে যে কার্যক্ষমতার সৃষ্টি হয়, সেই কার্যক্ষমতার ভিত্তির উপরে নির্ভর করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য বা ব্যর্থতা।'

এম এন লারমা আরো বলেছিলেন, 'রেলের যে কোন রকম উন্নতি সাধন হয় নাই, সে কথা আমি বলছি না। রেলের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করা হয়েছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সেতু এবং কালভার্ট এবং অনেক রেল স্টেশন মেরামত করা হয়েছে। অনেকগুলি স্বল্পকালীন করা হয়ছে এবং অনেকগুলি স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। কিন্তু এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল যে, রেলের সামগ্রিক উন্নতি, রেলের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে, রেলই দেশের যোগাযোগের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাকে সফলভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে রেল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রশাসনের যিনি কর্তাব্যক্তি, তিনি রেলব্যবস্থাকে সুন্দর করতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাত্রীদের জন্য

রেল-স্টেশনে বিশ্রামাগার, ট্রেনে উঠানামার স্থান, প্লাটফর্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে কারও দৃষ্টি নাই। আরও কত গলদ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। আগে রেল-বাজেট আলাদা থাকাকালে রেল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার সুযোগ পেতাম। এখন একে তো রেলকে সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার উপর আবার গিলোটিনের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং সব কথা বলার সুযোগ হবে না।'

বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান অবস্থা দেখলে এম এন লারমা যে আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তার বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই। বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না রেলওয়ে। গত সাত বছরে ৩১ হাজার কোটি টাকা খরচ করেও গতি বাড়েনি রেলের। সেবা না বাড়লেও সাম্প্রতিক সময়ে দুই দফা ভাড়া বেড়েছে। এরপরও বাড়ছে লোকসান। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেলের আয় হয়েছে ১ হাজার ৩৪ কোটি টাকা। এ সময় শুধু রেল পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে পরিচালন লোকসানই হয়েছে ১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা। আর প্রকল্পের ব্যয় ধরলে লোকসান বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। সরকার রেলকে সেবামূলক বললেও সেবা বাড়েনি মোটেও। রেলের এই দুরবস্থার পেছনে তিনটি বড় কারণ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ (প্রথম আলো, ২৫ জানুয়ারি ২০১৭)।

এম এন লারমা রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যে 'সহযোগিতামূলক কাজ'-এর কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা-কর্মচারি সম্বলিত রেলওয়ের টেকসই ব্যবস্থাপনা। অথচ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর এম এন লারমার কোন মতামত বা তাঁর উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে বিবেচনায় নেয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গোড়া থেকে যদি সঠিক ও নির্ভুল নীতি ও পরিকল্পনা নেয়া যেতো তাহলে বাংলাদেশ রেলওয়েকে বর্তমানে এরূপ নাজুক অবস্থায় পড়তে হতো না। অন্যদিকে তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-রেলওয়ের মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সঠিক ও টেকসই ব্যবহার করা সম্ভব হতো, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হতো বলে বলা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুশাসন, সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, আইনের শাসন ইত্যাদি। দেশের গণতান্ত্রিক শাসন না থাকলে হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকৃত উন্নয়ন অর্জিত হয় না বা সেই উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না। মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম সফল হতে পারে না। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে দিচ্ছে বলে প্রায়ই মন্ত্রী-আমলা উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। কিন্তু নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার যদি না থাকে, সেই জনগোষ্ঠীর উপর অপারেশন উত্তরণের মতো সেনাশাসন যদি বলবৎ থাকে, তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম কখনোই সেই জনগোষ্ঠীর উপকারে আসবে না। বরঞ্চ আরো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অবস্থাও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার স্পিরিট তথা স্বশাসনের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তিত হলেও সেসব পরিষদসমূহকে অথর্ব অবস্থায় রাখা হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, অনিয়ম ও দলীয়করণ। অপরদিকে দেশের মানবাধিকার বিষয়ক সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো হচ্ছে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, সরকারি বাহিনীর নির্বিচার বা বেআইনি আটক এবং গুম, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি। নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর তদন্ত ও দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নেই বললেই চলে। দুঃশাসনের বিষাক্ত ছোবলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, মানবাধিকারকর্মী, শ্রমিক নেতা, পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্ধকারের অতলে অথবা গোপন স্থানে বছরের পর বছর আটকিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কিছুদিন পর কারো কারো লাশ মিলেছে খালে-বিলে-নালা-ডোবায় কিংবা রাস্তার ধারে- এমনিতর অবস্থা বিরাজ করছে বর্তমানে।

এ ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্বিচার বা বেআইনি আটক, গুম ইত্যাদি মৌলিক অধিকার পরিপন্থী নিপীড়নের মূল সূত্র হচ্ছে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বা 'স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট'। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালে এ ধরনের কালো আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে এম এন লারমাসহ অনেক সংসদ সদস্য তার বিরোধিতা করেছিলেন। এম এন লারমা বলেছিলেন যে, 'স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট-এর আওতাভুক্ত আসামীদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং সেই স্পেশাল ট্রাইবুনাল-এর আসামীদের দোষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃক যে মাল-মসলা পাওয়া যায়, সেটা আসামীর পক্ষেই হোক অথবা বাদীর পক্ষেই হোক অথবা স্পেশাল ট্রাইবুনালের পক্ষেই হোক- সেটাকে অগ্রাহ্য করে নতুন করে পুনর্বিবেচনার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনালকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে আজকের এই সংশোধনী আনা হয়েছে। মাননীয় স্পিকার সাহেব, এটা সেই 'স্পেশাল পাওয়ারস এ্যাক্ট', যেটাকে অত্যন্ত শক্ত আইন হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এটা সম্বন্ধে সরকার-পক্ষের ভাষায় ছিল যে, যারা দুর্নীতিপরায়ণ, যারা দেশের শত্রু, যারা দেশের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিতে চাই তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য হল এই কঠোর আইন। অথচ আজকে আবার পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে সেটাকে শিথিল করে দেওয়ার জন্য যে সংশোধনী আনা হয়েছে, এটাকে একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এটা বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠরোধ করার জন্যই শুধু আনা হয়েছে।'

বস্তুত এম এন লারমা যে আশঙ্কার কথা ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন তা আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকে ব্যবহার করে সারা দেশে বিরোধী মতকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে আন্দোলনরত শক্তিকে দমন করা হচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ এই

আইনটি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সংসদ নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিল যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তারা প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যেতে বেশি সময় লাগেনি। তাদের দুঃশাসন বিরোধী আন্দোলন যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য কৌশলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনের নজিরবিহীন অপব্যবহার শুরু করে। এক্ষেত্রে প্রথমে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের জন্য 'নাশকতামূলক কাজে জড়িত'-কাহিনী প্রচার করে দমন অভিযানের সুচনা করে। প্রথম থেকেই সরকার রাজনৈতিক আক্রোশ মেটাবার হাতিয়ার হিসেবে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে আইনটির অপপ্রয়োগ করা আব্যাহত রাখে।

এম এন লারমা যথার্থই বলেছিলেন যে, 'আমরা এটাকে 'কালোতম আইন' বলেছিলাম, আমাদের সেই কালোতম আইন কথাটি ঠিকই ছিল। যারা চোরাকারবারী, যারা দেশের শত্রু, তাদেরকে এইভাবে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশোধনীটি যদিও ছোট, কিন্তু এর বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ।" যাদেরকে টার্গেট করে এই কালো আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেসময় তাদেরকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে সে সময়ে যেমনি, বর্তমান সময়েও তেমনি বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে, অধিকারকামী প্রান্তিক মানুষের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই আইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নসহ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সেনা-পুলিশের যোগসাজসে ও ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক লংগদুতে জুম্মদের ২৫০টি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা এবং তাতে ঘটনায় জড়িত আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের লোকজনদেরকে নির্লজ্জ দায়মুক্তি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেও পরবর্তী শেখ হাসিনা সরকার অনেকটা ইউ-টার্ন দেয়। চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনাশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রাখে। বিশেষ ক্ষমতা আইন থেকে অধিকতর ভয়াবহ এই 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনের বদৌলতে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকসহ অধিকারকামী জুম্ম গ্রামবাসীদের দমন-পীড়নের জন্য 'অপারেশন উত্তরণ'কে সেনাবাহিনী-বিজিবি ব্যবহার করছে। বিশেষ করে সেনা-বিজিবি-পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেফতার, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাসী ও তছনছ, জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৩০ জনকে গ্রেফতার, ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি, ৮৯ জনকে মারধর এবং জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। স্বশাসনের অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতা, জান-মালের নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। এ ধরনের আশঙ্কার কথা এম এন লারমা বহুবার তুলে ধরেছিলেন তাঁর সংসদীয় বিতর্কে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিস্টারীকরণ সংশোধনী) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। তাই ১৯৭৪ সালের মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিস্টারীকরণ সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করে এম এন লারমা জাতীয় সংসদে প্রতিবাদ জানান। মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিস্টারীকরণ সংশোধনী) বিল ১৯৭৪ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরতে গিয়ে এম এন লারমা বলেছিলেন যে, 'বাংলাদেশের সংসদ গঠিত হবার পর এমনি করে গতানুগতিকভাবে তাই একটার পর একটা বিল উপস্থাপিত হচ্ছে এবং সেই বিল আইনের আকারে দেশের মানুষের উপর প্রয়োগের জন্য সংসদে গ্রহণ করা হচ্ছে। আজকেও ঠিক তদ্রুপ একইভাবে এই বিল আনা হয়েছে আমাদের সামনে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমনি একটা ভয়াবহ আইন সংসদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই আইনের ফলে, মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদের মুখের ভাষা খুলে বলার উপায় থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হবে। আজকে দেশের যে অর্থনৈতিক দুর্ভোগ, সেই দুর্ভোগ-এর জন্য দায়ী কে? দায়ী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার। সবাই আশা রাখে যে, সরকার তার সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের মানুষকে নিশ্চয়তা দান করবে অথচ সেই নিশ্চয়তা দান না করে মানুষের কণ্ঠকে, মানুষের বাক-স্বাধীনতাকে হরণ করে নিচ্ছে। একের পর এক কালা-কানুন ও গণবিরোধী আইন করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাক-স্বাধীনতাকে হরণ করে, বাংলাদেশের মানুষের এগিয়ে চলার পথ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়ে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও বাক-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে'—এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে।'

এম এন লারমা আরো বলেছিলেন যে, 'এই স্বাধীন বাংলাকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। সেই দায়িত্ব পালনে সংবাদপত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সংবাদপত্রে মানুষের বাক-স্বাধীনতা প্রতিফলিত হয়। এই বাক-স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে আজকে মানুষ তার মনের কথা কিভাবে জানাবে? কিভাবে জানবে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, কোথায় কোথায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় কোথায় গলদ দেখা দিয়েছে? সেজন্য তার বাক-স্বাধীনতা যদি না থাকে, সরকারকে এইগুলি দেখিয়ে দেবে কিভাবে? সরকারের ব্যর্থতা যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে

তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকার কিভাবে তার ভুল সংশোধন করবে? আজকে বাংলাদেশের দুর্নাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। টোকিওতে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট-এ যে কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন একটা রূঢ় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। আজকে তদ্রুপ এমন একটি আইনে শুধু সংবাদপত্রের নাম করে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হল। এর জবাব সরকারের নিকট চাই।'

এম এন লারমার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেদিন সেই মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কালো আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমগুলোকে শৃঙ্খলা ও রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আনার পরিবর্তে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার জন্যই সেসময় তৎকালীন সরকার উক্ত আইন প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকারও তাদের পূর্বসূরীদের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে প্রতিনিয়ত মানুষকে হয়রানি করছে। বিশেষ করে এই আইনের ৫৭ ধারা আপত্তিজনক। এই ধারার মাধ্যমে পুলিশ যে কাউকে যে কোন সময় গ্রেপ্তার করতে পারে। ঠুনকো অভিযোগ হলেও এটা করতে পারে পুলিশ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে পছন্দ না হলে এই ধারায় যে কাউকেই দমনপীড়ন চালানো যাবে। এই অর্থে আর যাই হোক চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না। যা দেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ৫৭ ধারার কারণে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হতে পারছে না। মানুষ অবাধে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারছে না। তাদের মধ্যে ভয় কাজ করছে। কি বলে আবার কোন বিপদে পড়বে। এসব কিছু বিবেচনায় বলা যায় তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সাংঘর্ষিক। ইতিমধ্যে এই তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অনেক সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে। এই ধারা বাতিল বা শিথিল করার জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দাবি উঠলে পূর্বসূরীদের মতো যেভাবে এম এন লারমার মতামতকে হেলায় উপেক্ষা করা হয়েছিল বর্তমান সরকারও সেই গণদাবি অবহেলা করে চলেছে এবং এসব কালাকানুন অপপ্রয়োগ করে চলেছে।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতাকে নানাভাবে রুদ্ধ করা হচ্ছে। সেনা ক্যাম্প থেকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়া হয় যে, সেনাশাসনের বিরুদ্ধে টু শব্দও করা যাবে না; করলেই নির্যাতন অবধারিত। এভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক অবাধ নিপীড়ন-নির্যাতন ও যত্রতত্র অবৈধ গ্রেফতারের মাধ্যমে জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হচ্ছে এবং বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করা হচ্ছে। জুম্মদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের সংবাদ এবং আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদের আহুত জনসভা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, নানা কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশের উপর সরকারি বাহিনী থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে নিপীড়ন-নির্যাতন এবং আন্দোলনরত সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় না। এ ধরনের মৌলিক স্বাধীনতা পরিপন্থী কার্যকলাপের কথা এম এন লারমার তাঁর সংসদীয় জীবনে প্রায়ই তুলে ধরেছিলেন এবং জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বরাবরই সোচ্চার।

বস্তুত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আশা করেছিলেন, জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী শাসকশ্রেণি দেশের আপামর জনগণের শোষণ ও বঞ্চনার বেদনা বুঝবে। তারই আলোকে তিনি তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-রেলওয়ে ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রক্ষা ও সুষম ব্যবহারসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক বিষয় জাতীয় সংসদে তুলে ধরেছিলেন। রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আওয়াজ তুলেছিলেন গণমানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পক্ষে। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বার্থে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন শাসকশ্রেণির কালা-কানুন প্রণয়নের অপচেষ্টাকে। কিন্তু শাসকশ্রেণির তৎকালীন সাংসদ ও সংবিধান প্রণয়নকারীরা তাঁর দাবির আসল মর্মার্থ বুঝতে পারেননি এবং তাঁর ন্যায্য দাবিতে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালায়। এমনকি সংসদীয় বিতর্কের সময় শাসকমহলের তৎকালীন অনেক আইনপ্রণেতা এম এন লারমাকে হাসি-ঠাট্টা-তামাশা করতেও কার্পণ্য করেননি। বর্তমানে সারা দেশে জাত্যাভিমান, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের হীন তৎপরতা এখন চরম আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তি আসেনি। গণপরিষদে ও জাতীয় সংসদে মহান নেতা এম এন লারমার উত্থাপিত মতামত, চিন্তাধারা ও বিতর্ক বিবেচনায় নিলে দেশে বিদ্যমান বর্তমান অনেক অগণতান্ত্রিক ও উপনিবেশিক ধারা থেকে দেশবাসী রেহাই পেতো বলে বিবেচনা করা যায়।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: পিতা থেকে পৃথক

।। পাভেল পার্থ ।।

হর্ণফুলি দুলি দুলি
হুদু যেবে হনা
যেদুং চাং মুই ত সমারে
মরে নেযানা।

(কর্ণফুলি দুলে দুলে/কোথায় যাবে বল না/যেতে চাই আমি তোমার সাথে/আমাকে নিয়ে চল না)

১.

প্রজাতি হিসেবে মানুষ তাঁর জীবনচক্রে নিজ অভিজ্ঞতাকেই বহন করে বাঁচে। মানুষ সবসময় ঘুরেফিরে তার চারধারের অভিজ্ঞতারই পাঠ নেয়। নিজের যাপিতজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনের আখ্যান রপ্ত করে চলে। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকেও আমি এই আপন অভিজ্ঞতার বলয় থেকেই পাঠ করে চলেছি। কোনোভাবেই আমার যাপিতজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁকে 'বিচ্ছিন্ন' করিনি বা কোনো বিশেষ পরিচয়ের তকমায় তাঁকে 'অপর' করে দিইনি। চলতি লেখাটি এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ময়দান থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতো এক রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে পাঠ করবার এক গৌরচন্দ্রিকা।

২.

প্রীতি রঞ্জন দাশ, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, আমার বাবা। জন্মেছিলেন উপনিবেশিক অবিভক্ত ভারতে। ১৯৩৬ সনে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম ১৯৩৯ সনে। এঁরা দু'জন একই সময়ের মানুষ। আপন অভিজ্ঞতার বলয় থেকে আমি তাঁদের বেড়ে ওঠার জগত, শ্রেণিগত মিল-অমিল এবং মনস্তাত্ত্বিক ময়দানকে বোঝার চেষ্টা করেছি। বাবার ডাক নাম মন্টু আর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ডাকনাম মঞ্জু। প্রিয় এই ডাক নাম দুটিতেই চলতি আলাপে তাঁরা হাজির থাকছেন। মঞ্জুর শৈশব কেটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর থানার বুড়িঘাট মৌজার মাওরুম আদামে (চাকমা ভাষায় আদাম মানে গ্রাম)। আর সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের আলমহাডহর গ্রামে কেটেছে মন্টুর শিশুকাল। পাহাড় ও নদীর জটিল বাস্তুসংস্থান দেখে অভ্যস্ত হয়েছেন দু'জনেই। মন্টু পেয়েছেন যাদুকাটা-রক্তি নদীর সান্নিধ্য আর মঞ্জু পেয়েছেন বড়গাঙ-কর্ণফুলীর। শুকতারা আর বসুমতি পত্রিকা দিয়ে তাঁদের বইপড়া জীবনের শুরু। শরৎ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে রাশিয়া থেকে প্রকাশিত প্রগতি প্রকাশনীর বাংলা অনুবাদ দখল করে ছিল তাঁদের পাঠাগার। কৈশোরেই মন্টুর সান্নিধ্য ঘটে বিপ্লবী মণি সিংহ, রবি দাম, বরুণ রায়ের। মঞ্জুও কৈশোরে জড়িয়ে পড়েন প্রগতিশীল বামধারার ছাত্র আন্দোলনে। ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর মানবন্দ্রে নারায়ণ লারমা খুন হন, আমার বাবা এখনও এই প্রবীণ সময়ে এমনতর অন্যায় মুছে গিয়ে একটা নতুন ভোরের অপেক্ষা করেন।

> "১৯৭২ থেকে মানে স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে জাতীয়তার তর্ককে এখনও পর্যন্ত দেখা হচ্ছে বাঙালি চশমায়। এর বড় কারণ হলো বাঙালি মনোজগতের জাতিতাত্ত্বিক উপনিবেশ। কারণ একজন চাকমা বা লালেং বা একজন বাঙালি কী সাঁওতাল জাতি হওয়ার আখ্যান প্রথমত নিজ অভিজ্ঞতারই বয়ান।

৩.

মঞ্জু ও মন্টু উভয়ের রক্তে লেগে আছে বাংলাদেশের নানা উত্থান-পতনের দাগ। ১৯৪৭ সনে দেখেছেন চোখের সামনে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে দেশ। ভাষা আন্দোলন থেকে দাঙ্গা, গণঅভ্যুত্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রের অন্যায় জুলুমের ফলে উভয়কেই জন্মবাস্তু ফেলে নিরুদ্দেশ হতে হয়েছে, কেটেছে দুঃসহ শরণার্থী জীবন। মন্টুদের পরিবার প্রথম শরণার্থী হন দেশ স্বাধীনের আগে, মঞ্জুরা দেশ স্বাধীনের পর। চারদিকে তখন উচ্ছেদ আর যন্ত্রণার ছাপ। বসতজমিন ফেলে উভয়েই নদীর বুকে অন্যদের সাথে নৌকায়, কেউ যাদুকাটার জলে আর কেউ কর্ণফুলী গাঙে। গ্রাম ছাড়ার আগে তারা সাথে নিয়েছিলেন বসতঘর, জমিন, জুম আর গ্রামের মাটি। এই মাটির মাঝেই যেন দু'জনে খুঁজে পেয়েছিলেন যাপিতজীবনের ধূলিগন্ধমাখা দিনের স্মৃতি। পড়াশোনা শেষে মঞ্জু ও মন্টু উভয়ের কর্মজীবনই শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। একজনের হাওরে, আরেকজনের পাহাড়ে। মঞ্জু ও মন্টুর ভেতর এমনতর গভীর গোপন মিলগুলো দেশ স্বাধীনের সময় পর্যন্তই। তারপর যেন নিদারুণভাবে সব বদলে যায়, ওলটপালট হয়ে যায়। স্বাধীন দেশে এই দুই বেসামরিক নাগরিকের জীবন ভিন্ন দুই ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। মন্টুর শিক্ষকতা পেশা চূড়ান্ত হয়ে যায়, কিন্তু মঞ্জু হয়ে ওঠেন পাহাড়ের স্বাধিকার আন্দোলনের একজন বিপ্লবী যোদ্ধা।

৪.

মঞ্জুর শিশুকাল ও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গড়নের নজির আমি মন্টুর অভিজ্ঞতা দিয়ে পাঠ করতে পারি। এ নিয়ে আমি উভয়ের শৈশব ও কৈশোরকালীন অঞ্চলে নানাজনের সাথে আলাপ করেছি। সেই

সময়কার অনেকের বয়ান শুনেছি। বোঝা যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ এই বিশটি বছর এ অঞ্চলে বিকশিত হতে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণিগত উপাদান উভয়কেই স্পর্শ করেছিল। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকর্ম কী পারিবারিক সংস্কৃতি উভয়ের ভেতর একই ধারার বীজ বুনেছিল। সমাজতাত্ত্বিক ডিসকোর্সে হয়তো এই বীজের নাম 'শ্রেণিচেতনা'। কিন্তু এর পরের দশটি বছর তৎকালীন রাষ্ট্র অনেক বেশি সামরিক ও নিপীড়ক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের নানা নীতির কারণে মঞ্জু ও মন্টুর ভেতর দীর্ঘ ফারাক তৈরি হতে থাকে। কিন্তু কীভাবে তারপর যেন সবকিছুই দুম করে বদলে যায়। মঞ্জু ও মন্টুর ভেতর শ্রেণিগত ঐক্যের জায়গাগুলো চুরমার হয়ে যায়। আর এটি শুরু করে ষাটের দশকে কর্ণফুলী গাঙে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই কাপ্তাই বাঁধের ফলে মঞ্জুদের গ্রামবসতি সব তলিয়ে যায়। একলাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে মন্টুদের অনেকের এলাকায় বিদ্যুতের লাইন বসে। পরের দশ-পনের বছরে মন্টু বিদ্যুত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বিদ্যুত ব্যবহারের নিয়মিত বিল পরিশোধ করতে থাকেন। অপরদিকে মঞ্জু কাপ্তাই বাঁধকে প্রশ্ন করেন এবং এভাবে বিদ্যুত উৎপাদনের নামে জোর করে গ্রাম ডুবিয়ে মানুষ উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনআন্দোলনের ডাক দেন। এ সময়টাতেই রাষ্ট্রীয় দরবারে স্পষ্ট হতে থাকে মঞ্জু ও মন্টুর আরো অনেক পরিচয়, যার সাথে তাদের হাজার বছরের যাপিতজীবনের নিজ অভিজ্ঞতা মিশে আছে।

দেখা যায়, ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছরে এমনতর পরিচয়কে কোনো নাগরিককে স্পষ্ট করতে হয়নি। আর সেই পরিচয়ের রাষ্ট্রীয় নাম হল 'জাতীয়তা'। দেখা যায়, দেশভাগের আগ থেকে ভাষা আন্দোলন, দাঙ্গা কী মুক্তিযুদ্ধ কোথাও জাতীয়তার এমন নিজ অভিজ্ঞতার তর্ক জোরালো হয়নি। দেশ স্বাধীনের পর যা স্পষ্ট করে তোলেন মঞ্জু এবং জাতীয়তার প্রশ্নকে একটা তাত্ত্বিক রূপ দেন। দেশ স্বাধীনের আগ পর্যন্ত মন্টু কী মঞ্জুদের মতো পরিবারগুলোও একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপান্তরের ভেতর নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজে বিদ্যমান আরো নানা অস্তিত্বের সংকট এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপান্তর থেকে মঞ্জুদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কারণ এই শ্রেণি রূপান্তর প্রক্রিয়া প্রবলভাবে না হোক মঞ্জুর জাতিগত পরিচয়কে আড়াল করেই বৃহৎ শ্রেণিঐক্যর আদল দাঁড় করিয়েছিল। তাই বাংলাদেশের মতো একটি নয়া জাতিরাষ্ট্রের কাছে মঞ্জুর তুলে ধরা জাতীয়তার বিতর্ক অনেকখানি 'দুর্বোধ্য', 'ঝামেলাপূর্ণ' এবং 'অযৌক্তিক' মনে হয়। কারণ ততদিনে 'মূলধারা' ও 'সংখ্যালঘুতার' নিরিখগুলো পাল্টাতে শুরু করেছে এবং মঞ্জুদের পক্ষ থেকে জাতীয়তার পরিচয়কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করবার সাহস ও চল শুরু হয়ে গেছে।

স্বাধীন দেশের শুরুতেই তাই বাঙালির পাশাপাশি 'চাকমা', 'মারমা', ত্রিপুরা' এ ধরনের পরিচয়গুলো রাষ্ট্রীয় দরবারে একটা কেবল 'উটকো' নয় একটা 'স্তব্ধতাও' তৈরি করেছিল। মঞ্জু এবং মন্টুর শৈশব-কৈশোরের পাঠপ্রক্রিয়ায় তাদের শিক্ষালয় কী বসুমতী-শুকতারার পাতা বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আড্ডাগুলোতে এই 'জাতিগত পরিচয় তর্ক' প্রায় অনুপস্থিতই ছিল। কেউ নিজেকে 'চাকমা' হিসেবে তাঁর রাষ্ট্রীয় পরিচয় দাবি করতে পারে এবং তার 'জাতীয়তা' হিসেবেও চিহ্নিত হবে এই প্রশ্ন কারোর শিক্ষাঙ্গণ কী বইপুস্তকই তাদের রপ্ত করায়নি। আর এখানটাতেই মঞ্জু এবং মন্টুর ভেতর এক নিদারুণ ফারাক। অধিপতি ব্যবস্থা বলি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর শ্রেণিবৈষম্য যাই বলি না কেন এগুলো দীর্ঘসময় জুড়ে জাতিগত পরিচয়ের আপন ময়দানকে আড়াল করেই রেখেছিল। মঞ্জুই পয়লা এই আড়াল চুরমার করেছেন এবং তাত্ত্বিকভাবে এই পরিচয় স্বীকৃতির জন্য লড়াই শুরু করেছেন। আজকের দিনে এই জাতীয়তার পরিচয়-তর্ককেই আমরা বলছি 'আদিবাসী আত্মপরিচয়'। প্রায় একই শ্রেণিসূত্রে বড় হয়ে ওঠলেও আমার পিতা ইতিহাসে অধিপতি বাঙালি হয়ে ওঠেন আর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কেন তার নিজের উপর নিজের এই বাঙালি পরিচয়কে জোর করে চাপানো যাবে না সেই তর্কের সূত্রপাত ঘটান। বুঝতে পারি আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক, আর সেই অভিজ্ঞতা পৃথকের জায়গা থেকেই জানাবোঝাটা জরুরি। বুঝতে পারি মঞ্জুর সবকিছু মন্টুর অভিজ্ঞতায় কিংবা মন্টুর সবকিছু মঞ্জুর অভিজ্ঞতায় বোঝা সম্ভব নয়। আমার পিতা থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্পষ্টভাবে পৃথক তলটিই হচ্ছে 'আত্মপরিচয়'।

> হন মোনত্তুন এচ্ছোস তুই
> হন সায়রত যেবে
> মুইও যেম ত সমারে
> মরে হি তুই নিবে?

(কোন পাহাড়ে জন্ম তোমার/ কোন সাগরে যাবে/আমিও যাব তোমার সাথে/ আমাকে কী নেবে?)

৫.

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ দেশের সকল আদিবাসী জাতিকেই 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সংবিধানে দেশের সকল জাতিদের একত্রে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ১৯৭২ সনের জাতীয়তা সম্পর্কিত গণপরিষদের তৎকালীন তর্কটা কিছুটা দেখা যাক:

জনাব আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

> সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :
>
> '৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলে পরিচিত হবেন। মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান বিলে আছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।' এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর

রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে লেখা পড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ ....কেউ বলে নাই, আমি বাঙ্গালী। আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙ্গালী বলে পরিচিত করতে চায় .....।

জনাব স্পীকার : আপনি কি বাঙ্গালী হতে চান না?

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙ্গালী বলে মনে করি না। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙ্গালী বলে নয়[১]।

.... (সংশোধনী পাশ হয়ে যায়) ....

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহিত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

...(অতপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান) ...

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্পমন্ত্রী) : .....আমি পরিষদের তরফ থেকে দাঁড়িয়েছি। কারণ, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বাবু শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই পরিষদে আর ঘটে নাই। যেহেতু এর উপলক্ষ এই প্রস্তাবের সারমর্ম, সেইহেতু আমি এই প্রস্তাবের উপর দু'একটা কথা বলতে চাই। যে সংশোধনীর উপর তিনি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেছেন, সেটা গৃহীত হয়েছে। অতএব, তার উপর আমার কোন বক্তব্য পেশ করার অবকাশ নাই। আমরা জাতি হিসাবে বাঙ্গালী। তার সঙ্গে জেনারেল ওসমানী সাহেবের সংশোধনীর একটা ভাবগত মিল আছে বলে আমি মাননীয় সদস্য বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা যাতে ভুল না করেন, সেজন্য দাঁড়িয়েছি। বাঙ্গালী হিসাবে পরিচয় দিতে রাজী না হয়ে বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। আমরা শুধু পরিষদ-সদস্যবৃন্দই নই ---- আমি মনে করি, সারা বাঙ্গালী জাতি এতে মর্মাহত হয়েছে। আমি এটা না বললে পাছে ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেজন্য দাঁড়িয়েছি। সেজন্য বলতে চাই, তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের প্রস্তাব উত্থাপন না করে, বাঙ্গালী-পরিচয়ের প্রতিবাদে যাঁদের নাম করে এই পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তাঁরা বাঙ্গালী জাতির অঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তারা বাঙ্গালী। তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অঙ্গ বলে আমরা মনে করি। বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি বাংলা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না। একথা স্বীকার করার পরেও কেন তিনি চলে গেছেন, তা যদি তিনি বলতেন, তাহলে আমি এই পরিষদে তার জবাব দিতে পারতাম। তাঁর অনুপস্থিতিতে বলছি বলে এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। ঐ পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা অধিবাসী, তারা এই স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই অঙ্গ। বিশেষ করে কালকে আমাদের আইন-মন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি দীর্ঘ দিন যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সংসদীয় আইনের আওতা এবং বাইরের সভ্য জগতের আইনের আওতার বাইরে রেখে বিচ্ছিন্ন মনোভাবের সুযোগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল। আমরা তা চাই না, আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমমর্যদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙ্গালী জাতির গর্ব হিসাবে থাকবে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। যদি কেউ মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অনুন্নত অবস্থা, তার চেয়ে তুলনামুলকভাবে বাংলার অন্যান্য এলাকা অধিক অনুন্নত তাহলে তাঁরা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র দেশ এবং বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম। যে দেশের শিক্ষার হার কম, সে স্বভাবতঃই অনুন্নত হয়ে থাকে। এই অনুন্নতিই সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী প্রাণ দিয়েছে সেই অধিকার সংগ্রামে এবং সেই সংগ্রামের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যে একাত্মতা অনুভব করে নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে যে উদ্দেশ্যে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছেন, তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের জন্য তিনি সেটা করতে পারেন নাই -- যদিও তিনি গর্ব করে বলে থাকেন, আমি বাঙ্গালী নই। আমি বলব, যাদের ভোটে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের সহযোগিতা থেকে এ হাউস বঞ্চিত হয়েছে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাদের জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে তাদের প্রতিটি লোকের ধর্ম, নিজস্ব আচারের যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। সামগ্রীকভাবে আমরা বাঙ্গালী জাতি এবং বাঙ্গালী জাতি হিসাবে আমরা হচ্ছি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান- ঐক্যবদ্ধ শক্তি -- যার বলে আমরা বাঙ্গালী জাতি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যথা দেওয়া হবে। এবং ব্যথা দিয়ে কেউ হয়তো দেশের অমঙ্গলের চেষ্টা করতে পারবেন। এতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আসতে

---

১. বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় : সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), খণ্ড ২ সংখ্যা ১৩। মঙ্গলবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২

পারে না। বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এখন যেখানেই থাকুন না কেন, আমি তাকে আপনার মাধ্যমে আশ্বাস দিতে পারি, তাঁর বক্তব্য পেশ করার, তাঁর সংশোধনী দেওয়ার সবকিছুই বলার অধিকার আছে। কিন্তু 'বাঙ্গালী' বলে পরিচয় দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি যদি কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান, তাহলে তিনি শুধু এই পরিষদেরই নয় -- তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের মধ্যে একটা জাতি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনে ব্যথা দেবেন। সেজন্যই আমি দাঁড়িয়েছি। তার কাছে আমার অনুরোধ, তিনি পরিষদে এসে তাঁর দায়িত্ব পালন করুন। পরিষদে এসে এই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহান প্রস্তাবকে সফল করে তুলুন। আমি আশা করব যে, বাঙ্গালী হিসেবে তিনি তাঁর নিজস্ব অঞ্চল ও নিজের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি শেষ করছি।

জনাব স্পীকার : শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি এখন এই ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের পরে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করার জন্য এখানে একটি সংশোধনী এনেছি। আপনার অনুমতি নিয়ে এটা পাঠ করছি। আমি প্রস্তাব করছি যে --

> '৪৭ অনুচ্ছেদের পরে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হোক :
>
> '৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে।'

জনাব স্পীকার : ....

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি এই অনুচ্ছেদের সংশোধনী কেন দিয়েছি, সেটা আপনি যদি আমাকে সময় দেন, তাহলে বলতে পারি।

জনাব স্পীকার : দুই মিনিট বক্তৃতা করুন। এই সম্বন্ধে আপনি যথেষ্ট বক্তৃতা করেছেন। এখন শুধু তার পুনরাবৃত্তি হবে।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, পুনরাবৃত্তি করব না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক- এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ী' বা 'জুম্মা' জাতি বলি। মাননীয় স্পীকার, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি শুধু কেন এটা এনেছি, সেটাই আজকে এই মহান পরিষদে মাননীয় সদস্য, সদস্যা ভাই-বোনদের বলতে চাই।

জনাব স্পীকার : দুই মিনিট সময় আপনাকে দেওয়া হল। বলুন।

শ্রী লারমা : জনাব স্পীকার, স্যার, ভারত দখল করার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই উপমহাদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্নভাবে আইন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে শোষণ ব্যবস্থার পত্তন করে। বৃটিশ এই উপমহাদেশ দখল করার পর এই দেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে নিয়ে শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করে যায়। সেই শাসন-পদ্ধতি আমরা ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-আমল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পর্যন্ত দেখতে পাই। বৃটিশ তার সাম্রাজ্য রক্ষার সুবিধার্থে কাউকে বেশী, কাউকে মাঝামাঝি, কাউকে কম অধিকার দিয়ে এ দেশে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল।

জনাব স্পীকার : এই বক্তৃতা আপনি আগেও করেছেন। এতে নতুন কথা কিছুই নাই।

জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, মাননীয় সদস্য আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তির প্রতি, আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অবৈধ ভাষায় বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি ৪৭ অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে ৪৭ক নামে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানবে বলে মনে হয়। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতির বদলে যে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তারই প্রতি ষড়যন্ত্রমূলক এ বক্তব্য .. এবং ...

.... (বাধা প্রদান) ....

শ্রী লারমা : জনাব স্পীকার সাহেব, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথা বলছেন, তিনি যদি তাঁর এই কথা প্রত্যাহার না করেন, তাহলে আমি আর কোন কথাই বলব না।

১৯৭২ থেকে মানে স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে জাতীয়তার তর্ককে এখনও পর্যন্ত দেখা হচ্ছে বাঙালি চশমায়। এর বড় কারণ হলো বাঙালি মনোজগতের জাতিতাত্ত্বিক উপনিবেশ। কারণ একজন চাকমা বা লালেং বা একজন বাঙালি কী সাঁওতাল জাতি হওয়ার আখ্যান প্রথমত নিজ অভিজ্ঞতারই বয়ান। একজন মণিপুরী বা কোচ, রাখাইন বা কোল জাতির আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞতাই থাকে। অন্য জাতির পরিচয়ের পাটাতন তার ধারে অজানাই থাকে। তাই আমরা দেখি প্রতিটি জাতির নিজস্ব নাম-পরিচয় থাকা সত্ত্বেও অন্য জাতির কাছে তার পরিচয়টি ভিন্ন নয়। যেমন, বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণকে 'উপজাতি', উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল-ওঁরাওদের 'খৃষ্টান', চাবাগানের আদিবাসীদের 'কুলি' বলে। অপরদিকে সাঁওতালরা রাজশাহীর কড়া আদিবাসীদের 'কোল-কামার' বলেন, কড়ারা বাঙালি মুসলিমদের বলেন ডেন্ডে। নিজেরা নিজেদের মান্দি বললেও বাইরে গারো এবং লালেংরা বাইরে পাত্র নামেই পরিচিত। জাতিগত পরিচয় ঘিরে এই যে অমীমাংসিত তর্ক তার মূলে আছে জাতিসমূহের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ময়দান থেকে জাতীয়তাকে না দেখার প্রবল বাহাদুরি। কায়দা হিসেবে এটি উপনিবেশিক এবং জাঁদরেল। শেষতক এটি কারোর জন্যই কোনো মঙ্গলবার্তা বয়ে আনে না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তর্ককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কী লাভ হয়েছে? কার লাভ হয়েছে? যখন এই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের তেজ দমাতে জলপাই বাহাদুরির রসদ কমেছে বরং একটা সময় পাহাড় ভরিয়ে তোলা হয়েছে বহিরাগত সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসন করে। ফলটা কী হলো। নির্দয়ভাবে দেশে পাহাড়ধসের সূত্রপাত হলো। মরলো তো সেই গরিব মানুষই। তারপরও কিন্তু রাষ্ট্রীয় মনোজগত একচুল বদলাল না, বরং বাঙালি জাতীয়তা আরো পেশী-মাংসে প্রবল হল।

৬.

১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্কে তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বলেছিলেন, একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যদাজনক নয়[২]? সেই নেতাই দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আবার জাতীয় সংসদে ২০১১ সনে দেশের আদিবাসী জনগণকে 'উপজাতি' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রস্তাব পেশ করলেন।

২০১১ সালের ৮ জুন সংশোধনী প্রতিবেদন সংসদে পেশকালে কমিটির চেয়ারপার্সন ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী তার সংসদীয় বক্তৃতায় বলেন:

মাননীয় স্পীকার, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন উপ-জাতিসহ অন্যান্য জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নাগরিক রয়েছে। তাদের আঞ্চলিক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকশিত করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে[৩]। মাননীয় স্পীকার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদেশের আপামর জনগণকে সাথে নিয়ে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জননেত্রী শেখ হাসিনার দিনবদলের রাজনীতিতে সামিল হয়ে গড়ে তুলতে পারবো এমন এক বাংলাদেশ যেখানে থাকবে সম্প্রীতি আর ঐক্যের মেলবন্ধন, হতাশাক্লিষ্ট ও বঞ্চিতরা লাভ করবে স্বস্তি আর সমৃদ্ধি, প্রকৃতি ফিরে পাবে তার আপন রূপ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা খুঁজে পাবে তার প্রকৃত সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ফিরে পাবে তার আপন চলার গতি, ধর্ম হবে যার যার, রাষ্ট্র হবে সব ধর্মের, ভবিষ্যত প্রজন্ম পাবে আগামী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার অনিঃশেষ অনুপ্রেরণা। আসুন আমরা আমাদের অফুরন্ত কর্মস্পৃহা, গভীর দেশপ্রেম ও অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলি উন্নত বাংলাদেশ।[৪]

নিদারুণভাবে ২০১৭ সনেও দেশের আদিবাসী জনগণকে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির জন্য লড়তে হচ্ছে। রক্তাক্ত, খুন, উচ্ছেদ, ধর্ষিত হতে হচ্ছে। চলতি আলাপখানি আদিবাসী আত্মপরিচয়ের মর্যাদা ও স্বীকৃতি দাবি করে। পাশাপাশি এই আত্মপরিচয়ের ময়দান থেকে রাষ্ট্রের জাতীয়তার তাত্ত্বিক রূপান্তরের প্রস্তাব জানায়। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই বাংলাদেশের সংবিধান, 'এই দেশ বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, লিঙ্গ, প্রতিবেশ, ভূগোল, শ্রেণিবৈচিত্র্যের দেশ' এরকম একটি বাক্য দিয়ে শুরু হতে পারে।

চলতি আলাপখানি আবারো মঞ্জু ও মন্টুর শৈশবের এক অভিজ্ঞতা দিয়ে ইতি টানতে চাই। মঞ্জু তখন রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থী। যারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে তাদের নিয়মিত ক্লাশ ছিল না। কিন্তু হোস্টেলসুপার অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদেরও একসাথে ভাত খাওয়ার নির্দেশ দেন। পরীক্ষার্থীরা জানায়, তারা পড়া শেষ করে সুবিধামত একটা সময় খাবে। এ নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মঞ্জু এ ঘটনার প্রতিবাদে অনশন করেন এবং হোস্টেল সুপার মঞ্জুদের দাবি মেনে নেন। মন্টু যখন ফতেপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ছেন, তখন হঠাৎ বই-খাতার দাম বেড়ে যায়। গ্রাম ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে মিছিল নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে মূল্য কমানোর দাবি জানান। কর্তৃপক্ষ পরে গরিব শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কাগজ-খাতা-কলম সরবরাহ করে। দেখা যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পাহাড় কী হাওরে বাঙালি কী চাকমা সমাজের অনেক পরিবারে কোনো না কোনোভাবে একের প্রতি অপরের সম্পর্ক স্থাপনের একটা চল শুরু হয়েছিল। এক ধরনের শ্রেণিঐক্য। আমরা মঞ্জু ও মন্টুর শৈশবে তাই দেখি, হয়তো লাখো অযুত মঞ্জু-মন্টুরাই এরকম শৈশব পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু মঞ্জুকে পরবর্তীতে 'আত্মপরিচয়' নিয়ে রাষ্ট্রকে এক কঠিন প্রশ্ন করতে হয়েছে। কারণ রাষ্ট্র মঞ্জুর নিজ অভিজ্ঞতা আর পরিচয়কে জোর করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল, এখনও করছে। আর এ জায়গাটাকে স্পষ্ট রেখেই আজকের শ্রেণিঐক্য গড়ে ওঠুক। আজকের মঞ্জু ও মন্টুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে শিখুক। একের চশমায় অন্যের দুনিয়াকে দেখতে শিখুক। ডিজিটাল ডিভাইসে অভ্যস্ত ও ভার্চুয়াল বাস্তবতায় মুখর আজকের মঞ্জু ও মন্টুদের কী কোনো শ্রেণিঐক্য গড়ে ওঠছে? তাদের শিখন ও পঠনপ্রক্রিয়া কী নিজ অভিজ্ঞতার কাছাকাছি? এমনতর বিতর্কের ভেতরেও আমরা প্রবলভাবে আজকের প্রজন্মের উপর আস্থা রাখতে চাই। বিশ্বাস করি আজকের মঞ্জু-মন্টুরা বড় হলে পাহাড় কী হাওরে বিস্তৃত হবে স্বপ্নময় সম্ভাবনা। আমার পিতা কী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেইসব সম্ভাবনার কথা অনেকের সাথেই আলাপ করতেন, তাঁদের শৈশবস্থলে গেলে এখনও সেই টুকরো টুকরো স্বপ্নতরঙ্গ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দেখা যায়, বোঝা যায়, স্পর্শ করা যায়।

দেয দুনিয়ে চেবার চাং মুই
ন গুরিস তুই মানা
যেদুং চাং মুই ত সমারে
মরে নে যানা।

(দেশ দুনিয়া দেখতে চাই আমি/ আমায় মানা কর না/যেতে চাই আমি তোমার সাথে/আমাকে নিয়ে চল না)

....

পাভেল পার্থ, গবেষক ও লেখক।
ই-মেইল : animistbangla@gmail.com

২. বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় : সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

৩. নবম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট। জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, জুন ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ.৫

৪. নবম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট। জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, জুন ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ. ৬

এখনও মিছিলে ধ্বনিত হয় এম এন লারমা

॥ দীপায়ন খীসা ॥

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এক মহান বিপ্লবীর নাম। নিপীড়িত জাতিসমূহের এবং শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের এক মহানায়ক। জন্মেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি শহরের অদূরে মাওরুম নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। উনিশ শতকের সেই সময়ে পাহাড়ি জনপদে শিক্ষার প্রসারে এই গ্রামটি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিল। পশ্চাৎপদ জনপদে শিক্ষার আলো ছড়ানোর পাশাপাশি অধিকার আদায়ের চেতনার উন্মেষ ঘটাতেও এই মাওরুম এর অবদান অনস্বীকার্য। মানবেন্দ্র লারমা সেই গ্রাম থেকে পুরো পার্বত্য এলাকায় জুম্ম জনগণের মধ্যে বিপ্লবী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

পার্বত্য এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এলাকা হিসেবে পার্বত্য জনপদের জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাঁর চিন্তার দর্শন ছিল বিশ্ব মানবতার মুক্তি। গণপরিষদে ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু মাত্র জুম্ম জনগণের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন তা নয়। সদ্য স্বাধীন দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ ভালবাসা। সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত মানবেন্দ্র লারমা শ্রমজীবী মেহনতি জনতার অধিকারের কথা বার বার গণপরিষদ বিতর্কে তুলে ধরেছেন। মাঝি-মাল্লা, রিক্সাচালক, খেটে খাওয়া কৃষক, দিনমজুর, কল-কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের কথা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার বিষয়ে আইনপ্রণেতাদের বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সংবিধানের মৌলিক প্রশ্নে তিনি মোট ২৫টি সংশোধনী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপট, উগ্র জাতীয়তাবাদী দেমাগ সেসব বিষয় ফয়সালা করেনি। যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীন দেশের রচিত সংবিধান জাতিগত সাম্য, নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের দিকগুলো নিষ্পত্তি করতে পারেনি।

> “মাঝি-মাল্লা, রিক্সাচালক, খেটে খাওয়া কৃষক, দিনমজুর, কল-কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের কথা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার বিষয়ে আইনপ্রণেতাদের বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সংবিধানের মৌলিক প্রশ্নে তিনি মোট ২৫টি সংশোধনী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপট, উগ্র জাতীয়তাবাদী দেমাগ সেসব বিষয় ফয়সালা করেনি। যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীন দেশের রচিত সংবিধান জাতিগত সাম্য, নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের দিকগুলো নিষ্পত্তি করতে পারেনি।

সমাজে নারীর সমমর্যাদার বিষয়ে লারমা বলেছিলেন, একজন পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে একজন নারীও সে অধিকার ভোগ করতে পারাটাই হচ্ছে নারী অধিকার। এই সোজা সাপ্টা কথাটা সেই সময়কার আইন প্রণেতারা অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের দুঃসহ জীবনের বিষয়ে সংসদের গোচরে আনতে চেয়েছেন। আইন প্রণয়নের মহান জায়গায় দাঁড়িয়ে নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের জীবনকে বদলানোর আওয়াজ তুলেছেন। সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন।

দেশের কৃষি ব্যবস্থাপনা, শিল্প, নাগরিক অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিষয়ে গণপরিষদ ও সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও মতামত তাঁকে একজন পরিপূর্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে। অথচ তিনি তখন মাত্র শুরু করেছিলেন। ৩৩-৩৪ বছরের উচ্ছল যুবার অসাধারণ ধীশক্তি, সমাজ চিন্তা, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর মেধাবী ও সুদূর প্রসারী ভাবনা যদি সেদিন সংবিধান প্রণয়নের সময় গ্রহণ করা হতো তাহলে হয়ত আমরা অন্য এক বাংলাদেশ পেতাম। কথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টিও আইন প্রণেতা লারমা এড়িয়ে যাননি। সংসদে সেই সময় খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী সম্ভবত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে খ্রীষ্ট ধর্ম উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টি নজরে আনেন।

তারপরও লারমার সকল ধ্যান জ্ঞান ছিল শোষিত ও চির নিপীড়িত তাঁর নিজ জুম্ম জনগণের প্রতি। ড. কামাল হোসেন সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, সেই সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি এম এন লারমা সব সময় বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সেই জুম্ম জনগণের অধিকারের বিষয়ে সর্বক্ষণ সোচ্চার থেকেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারতেন। কিন্তু জুম্ম জনগণের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ লারমা সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করেছেন। প্রবল জাত্যভিমানী, বাঙালি দেমাগের কাছে বঞ্চিত লারমা

জুম্ম জনগণের মুক্তির জন্য তাঁর শেকড়ে ফিরে গেলেন। নিয়মতান্ত্রিকতার পথ রুদ্ধ হলে গেরিলা জীবন বেছে নিলেন। গড়ে তুললেন এক মহাকাব্যিক প্রতিরোধ সংগ্রাম। রাষ্ট্রীয় শোষণ নিপীড়ন থেকে জুম্ম জাতির মুক্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ে পাহাড়ে, জুম ক্ষেতে. বন-বনানীতে শুরু হলো গেরিলা প্রতিরোধ। সামন্ত চিন্তার শৃঙ্খলে বন্দী জুম্ম জনগণের মধ্যে মানব মুক্তির প্রগতিশীল দর্শনের উন্মেষ ঘটানো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু মানবেন্দ্র লারমার জীবন দর্শন সেই পথেই হেঁটেছে। পশ্চাৎপদ সামন্তীয় সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত করে নতুন সমাজ বিনির্মাণে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সমাজ জীবনকে প্রগতিশীল রূপান্তরের পথে এক সাহসী অভিযাত্রায় সামিল করেছিল।

মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম গণসংগ্রামের এক অনন্য চরিত্র অর্জন করেছিল। তাই তো প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। জনযুদ্ধের রূপ নেওয়া প্রতিরোধ সংগ্রামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ও বিভেদ আনয়নের অসৎ উদ্দেশ্যে কথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই-এর সস্তা মুখরোচক ও চটকদারী বিষয় তারা হাজির করে। মহান পার্টির মধ্যে অনৈক্যের পরগাছারা ডাল প্রশাখা মেলার কু-তৎপরতা শুরু করে। মানবেন্দ্র লারমা এই ষড়যন্ত্র তাঁর চিরাচরিত ধীশক্তি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার পথে অগ্রসর হন। কথিত দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই-এর কুচক্রীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 'ক্ষমা করো ভুলে যাও' এই নীতিতে জনসংহতি সমিতির ঐক্য রক্ষার চেষ্টা চালাতে থাকেন। ষড়যন্ত্রকারীদের চিন্তা ছিল বিপরীত। তিল তিল করে গড়ে উঠা প্রতিরোধ সংগ্রামকে অনৈক্য আর বিভেদের চোরাবালিতে তলিয়ে নিতে তাদের আয়োজন চলতে থাকে। কুচক্রীরা বিভিন্ন স্থানে পার্টির সদস্যদের মধ্যে সশস্ত্র অন্তর্ঘাত কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করে। তার পরও লারমা পার্টির ঐক্যের প্রতি অবিচল ছিলেন।

জুম্ম মুক্তি সংগ্রামের এই ঘটনা প্রবাহ যে সময় ঘটছিল, তখন লেখক বালক। সময়টা ১৯৮২-৮৩। সম্ভব তখন ৭ম কিংবা ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। বান্দরবান জেলা শহরে এই টালমাতাল রাজনীতির উত্তাপ ঠাহর করা যেতনা। আর নিম্ন মাধ্যমিক পড়ুয়া এক ছাত্রের তো বুঝ পাওয়া ঢেড় কঠিন। স্কুলের ছুটিতে খাগড়াছড়ির নাকশাতলী গ্রামের বাড়িতে যেতাম, কিংবা মহালছড়ির দাদু বাড়িতে। সেই সময় বড়দের মুখে শুনতাম লাম্বা-বাদির যুদ্ধ চলছে। তারও আগে মোটা দাগে শান্তিবাহিনীর নাম শুনতাম। বাল্য বয়সে বেশ কয়েকবার শান্তিবাহিনী দেখার ঝাপসা স্মৃতিও এখন মনে পড়ে। লাম্বা-বাদি কী, কেন যুদ্ধ চলছে তা ঠিক অনুধাবন করার বয়স তখন ছিল না। এরই মধ্যে বান্দরবানে জ্যেঠার বাসায় কানা-ঘুষা শুনলাম লারমাকে নাকি মেরে ফেলা হয়েছে। বড়দের মধ্যে একটু চিন্তার ছাপও দেখেছিলাম। তখনও লারমা কে ছিলেন তা জানা ছিল না। তবে বাদি গ্রুপ লারমাকে মেরেছে এটা আমজনতার মুখে মুখে, কানে কানে পৌঁছে গেছে। তারপর আবার শুনলাম বাদি গ্রুপ নাকি সারেন্ডার করছে। সেই বাদি গ্রুপের এক সদস্য সদ্য পাওয়া চাকুরির সুবাদে বান্দরবানে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। পরিচয় পর্বে তিনি জানালেন তার বাড়ি মহালছড়িতে। আমাদের আত্মীয় হন এবং তিনি সারেন্ডার করা বাদী গ্রুপের সদস্য। আমরা চিরায়ত অভ্যাস অনুসারে চায়ের আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় আদেশ হল চা, নাস্তা, এমনকি পানিও দেয়া যাবে না। জ্যেঠা মহাশয় ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বেটারা লারমাকে মেরেছে, সারেন্ডার করেছে আবার চাকুরিও পেয়েছে। আমার মনের স্মৃতিতে এখনও সেই ঘটনাটি গেঁথে আছে। বাদী গ্রুপ লারমাকে হত্যা করেছে, তাই বাদী গ্রুপের সদস্যদের প্রতি একটা সামাজিক ঘৃণা তখন বেশ জ্বল জ্বল ছিল।

কলেজ বয়সে যখন পাহাড়ের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের প্রজম্ম সংগঠিত হচ্ছিল। সেই সময়কালীন জনসংহতির মুখপত্র জুম্ম সংবাদ বুলেটিন ১০ নভেম্বর সংখ্যা হাতে আসলে গোগ্রাসে পড়ে ফেলতাম। অবশ্য পড়তে হত লুকিয়ে। তখনতো বিদ্রোহীদের মুখপত্র পড়াও অপরাধ। অনেক শ্যেন দৃষ্টির নজরদারি এড়িয়ে দু-একটা কপি শহরে চলে আসত। সেইগুলো আবার হাতে পাওয়াও ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। এইভাবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে পাঠ করা শুরু। সেই সময় দেখেছি মৃত লারমা শাসকগোষ্ঠীর নিকট কী পরিমাণ আতংকের নাম ছিল। লারমাকে প্রকাশ্যে স্মরণ করাটাও সেইদিনগুলোতে খুব কঠিন ছিল। সেনা নির্যাতন এবং গ্রেফতার হওয়ার ভয়ের মধ্যেও ১০ নভেম্বর এলে আকাশ ফানুসে ফানুসে ছেয়ে যেত। মানুষ বুঝত ১০ নভেম্বর এসেছে, লারমার স্মরণে ফানুস উড়ানো হচ্ছে। স্মরণ করার যে আনুষ্ঠানিকতা তখনও সেইভাবে দৃশ্যমান ছিল না। সেনা চোখ রাঙানির মধ্যে প্রকাশ্যে সেই আনুষ্ঠানিকতা পালন করাটাও খুব কঠিন কাজ ছিল। গোপনে শোকসভা হত, বিশেষ করে ছাত্র-যুবারা সেই গোপন শোক সভায় মিলিত হতো। প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থীরা লারমাকে হত্যা করেছে ঠিকই। কিন্তু পাহাড়ের জুম্ম জনগণের হৃদয়ে লারমা সব সময় দীপ্যমান। আমরা যারা লারমাকে সশরীরে দেখিনি, কিন্তু তার জীবন পাঠ করেছি, এখনও অনুশীলন করছি, তাদের জন্য লারমা এক চেতনার নাম।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছাত্র সমাজের কাছে লারমা দ্রোহী এক নামের স্মারক। শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে লারমা নামটি প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যোগায়। দেশের সকল অঞ্চলে নিপীড়িত আদিবাসী জাতিসমূহ যখন প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদী মিছিলে শরীক হয় তখনও লারমা সেই প্রতিবাদকে শানিত করে। প্রতিবাদী জাগরণের গানেও লারমা গলা ছেড়ে গাইতে সাহস যোগায়। নারী মুক্তির জন্য রাজপথ যখন মুখরিত হয় তখনও গগণ-বিদারী কণ্ঠে লারমার নাম শুনা যায়। প্রতিরোধ সংগ্রামে, রাজপথের সাহসী মিছিলে, শ্রমজীবী মেহনতি জনতা ও নিপীড়িত জতিসমূহের মুক্তির লড়াইয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নাম ধ্বনিত হতে থাকবে চিরকাল। তাইতো এখনও মিছিলে ধ্বনিত হয় এম এন লারমা তোমার নাম। লারমা তোমাকে লাল সালাম।

চারু ও কারু শিল্পী গৌতম মুনি চাকমা অংকন

।। সত্যবীর দেওয়ান ।।

সস্ত্রীক গৌতম মুনি চাকমা

শ্রী গৌতম মুনি চাকমা ১৯৩৯ সনের ১১ নভেম্বর রাঙ্গামাটি সদর থানার অন্তর্গত ১১৪ নং বালুখালী মৌজায় পুরাতন বালুখালী গ্রামে (বর্তমানে তা কাপ্তাই বাঁধের জলে নিমগ্ন) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব জীবন ঐ গ্রামেই কাটে। শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয় মগবান জুনিয়র হাইস্কুল থেকে। সেখান থেকে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পাশ করেন। তৎপর রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৬১ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেন। তাতে তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি রাঙ্গামাটির মাঝের বস্তীর নিজ বাসভবন থেকে যাবতীয় শিল্পকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন।

> “ ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং সবসময় হাস্য-রসিক প্রকৃতির। কর্মী বাহিনীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তিনি যেখানেই থাকেন না কেন, সবসময় কর্মীদের হাস্য-রসিক গল্প বলে মাতিয়ে রাখতেন। কর্মীবাহিনী ও জনগণের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বসুলভ। তার নির্মিত বহু শিল্পকর্ম-ভাস্কর্য, সাইনবোর্ড (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের) গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আজও বিদ্যমান। যতবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে, তাঁকে সদা-হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। কোন সময়েই তাঁকে আমি বিমর্ষ, দুঃখে ভারাক্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত এমন অবস্থায় দেখিনি।

১৯৭২ সন হতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে গৌতম মুনি চাকমা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছাত্র জীবন থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সাথে যুক্ত থেকে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে এক রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খোন্দকার মোস্তাক ক্ষমতা দখল করলো। তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাকশালে যোগদান করার কারণে মোস্তাক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকারি গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠে। সে কারণে আমাদের এই শিল্পী গৌতম মুনি চাকমাকেও আত্মগোপন করতে হয় ১৯৭৫ সনে। তখন হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথে চালানোর পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হতে থাকে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। আর এই আন্দোলন দীর্ঘ দুই যুগের অধিক চলার পর

অবশেষে ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যগণের সঙ্গে গৌতম মুনি চাকমাও প্রত্যাগত হন। বলতে গেলে ১৯৭৫ সন হতে ১৯৯৭ সন পার্বত্য চুক্তি অবধি নিয়মতান্ত্রিক এবং সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র ‘জুম্ম সংবাদ বুলেটিন’সহ অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রচ্ছদ, নির্দেশনাসহ সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে গৌতম দা-র ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

তিনি শিল্পকর্মকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সশস্ত্র আন্দোলনে সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম মানচিত্র অংকন করতেন। অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের উপর তাঁর অঙ্কিত তুলনামূলক মানচিত্র ও কার্টুনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে দেশে-বিদেশে সহজে তুলে ধরা সম্ভব

হয়েছে। গৌতম মুনি চাকমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালে পার্টির মধ্যে একদল চারুশিল্পী গড়ে তোলা হয়। তাঁর গড়ে তোলা সদস্যরা আন্দোলনের উপর, সরকারি বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন, গণহত্যা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ছবি এঁকেছেন যেগুলো আন্দোলনের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং সবসময় হাস্য-রসিক প্রকৃতির। কর্মী বাহিনীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তিনি যেখানেই থাকেন না কেন, সবসময় কর্মীদের হাস্য-রসিক গল্প বলে মাতিয়ে রাখতেন। কর্মীবাহিনী ও জনগণের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বসুলভ। তাঁর নির্মিত বহু শিল্পকর্ম-ভাস্কর্য, সাইনবোর্ড (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের) গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আজও বিদ্যমান। যতবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে, তাঁকে সদা-হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। কোন সময়েই তাঁকে আমি বিমর্ষ, দুঃখে ভারাক্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত এমন অবস্থায় দেখিনি।

এই মহান চারু ও কারুকলা শিল্পী গৌতম মুনি চাকমা বিগত ১৯ এপ্রিল ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি যুবলীলা চাকমাসহ দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা এবং পুত্র-কন্যাদের ঘরে আসা বহু নাতি-নাতনি রেখে যান। উল্লেখ্য যে, তাঁর বড় মেয়ে মিতালী চাকমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী তারুম চাকমা ঢাকা আর্ট কলেজ হতে ফাইন আর্টস-এ মাস্টার্স করেছেন।

প্রয়াত গৌতম মুনি চাকমা (অংকন) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম প্রখ্যাত চারু ও কারু শিল্পী প্রয়াত চুনীলাল দেওয়ানের পর দ্বিতীয় চারু ও কারু শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। চুনীলাল দেওয়ান ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী এবং চারু-কারু শিল্পী আর গৌতম মুনি চাকমা হচ্ছেন একাধারে চারু-কারু শিল্পী অন্যদিকে তিনি হচ্ছেন জুম্ম জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের একজন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে অনেক প্রবীণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ছবি যেমনি অংকন করেছেন তেমনি তার পাশাপাশি তৎসময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকারি বাহিনীর তথা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র তিনি পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তব চিত্র রঙের তুলির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৩ সনে ১৭ নভেম্বর তারিখে পরিকল্পিতভাবে নানিয়ারচর গণহত্যার চিত্র অন্যতম। সমধিক উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময়ে সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার চিত্র জুম্ম সংবাদ বুলেটিন ও স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যদিকে তিনি যেখানেই যান না কেন সেখানকার জনগণের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে তুলেন অতি সহজেই। যে কারণে চুক্তির পূর্বে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত গ্রামে কর্মী পরিবারগুলো অবস্থান করতো সে সমস্ত গ্রামের জনগণের সাথে কর্মী পরিবারগুলোর সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা অপরিসীম। তিনি একাধারে চিত্র শিল্পী অন্যদিকে সংগঠক। কর্মী ও জনগণের সাথে তাঁর অমায়িক ব্যবহার, গঠনমূলক গণমুখী আচরণের জন্যেই তিনি কর্মী ও জনগণের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

আজ গৌতম মুনি চাকমা আমাদের মাঝে নেই। তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে তিনি জুম্ম সমাজের কাছে জুম্ম জনগণের কাছে চিরকাল অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর অমূল্য অবদান জুম্ম জাতির কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই জুম্ম জাতি যতদিন এই পৃথিবীর বুকে নিজ অস্তিত্ব নিয়ে ঠিকে থাকবে, এই বিপ্লবী চিত্রশিল্পী গৌতম মুনি চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। এই মহান শিল্পীর সর্বশেষ শিল্পকর্ম সম্ভবতঃ কাপ্তাই বাঁধের জলে তলিয়ে যাওয়া পুরাতন রাঙ্গামাটি টাউন এবং কর্ণফুলী নদীর পূর্ব কূলে চাকমা রাজার রাজবাড়ির নক্‌শা চিত্র। উক্ত নক্‌শাটি শ্রী স্নেহ কুমার চাকমার লিখিত 'জীবনালেখ্য' নামক গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক চারু ও কারু শিল্পী গড়ে উঠলেও কিন্তু তাঁর মত ত্যাগী, জুম্ম জনগণের স্বার্থে নিবেদিত দেশপ্রেমিক শিল্পী আজও আমাদের মাঝে অনুপস্থিত। আমাদের গৌতম মুনি চাকমা নিজের জীবন-যৌবন, মেধা, মনন, প্রতিভা জুম্ম জনগণের স্বার্থে অকাতরে দান করে গেছেন। তাঁর এই অমূল্য অবদান জুম্ম জাতির কাছে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ

মহান শিক্ষাগুরু ও দেশপ্রেমিক চিত্ত কিশোর চাকমা

।। আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক ।।

আমার চোখে তিনি মহান এক শিক্ষাগুরু, এক সুযোগ্য পিতা, এক নিখাদ দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদীও বটে। তিনি চিত্ত কিশোর চাকমা আমার হাই স্কুল জীবনের শিক্ষক ও অভিভাবক এবং তিনিই আমাদের প্রয়াত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পিতা। শৈশবে, বিশেষত হাই স্কুল জীবনের মাত্র দুই-তিন বছর তাঁর অপার স্নেহময় সান্নিধ্যে থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই সময় তাঁকে বুঝবার মত বয়স-বুদ্ধি আমার হয়নি। তবে সেই সময়কার কিছু স্মৃতি স্মরণ করে তার মূল্য আজ গভীরভাবে অনুভব করি।

জানা যায়, শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমার জন্ম হয় ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের বসন্ত মৌসুমে কোন এক ঊষালগ্নে, তৎকালীন সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ঐতিহাসিক ও বর্ধিষ্ণু জনপদ মহাপুরম নামক গ্রামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মহাপুরমেরই 'গড়হেড' নামক একটি স্থানে তৎকালীন চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ব্রিটিশদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এক দূর্গ গড়ে তোলেন। চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁর এক কবিতায় লেখেন–

> 'গড়ের পাহাড়–একদা উচ্চ শিখরে যার
> গড়েছিল চাকমা রাজা শক্ত বিশাল গড়,
> রান্যার প্রান্তরে জিনিয়া রনে মহাবীর
> রেখেছিল স্বাধীন স্বদেশ চাকমা জাতির।'

চিত্ত কিশোর চাকমা পিতা চানমনি চাকমা ও মাতা সুন্দরপুদি চাকমার (মতান্তরে সুন্দরবি) সর্বকনিষ্ট সন্তান। চানমুনি চাকমা ছিলেন কৃষিজীবী। ফলে অর্থনৈতিকভাবে পরিবারটি ছিল অবস্থাপন্ন। চানমুনি চাকমার পরিবার ও তাঁর পূর্বপুরুষরা একসময় ছিল নান্যাচরের বর্তমান ঘিলাছড়ি বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে সত্তা-ধ্রুং এলাকায় কেরেতকাবা মোনতলা নামক স্থানে। পরে সেখান থেকে চানমনি চাকমার পরিবারটি ঘিলাছড়িতে বসতিস্থাপন করে এবং এরপর মহাপুরম এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি গাড়ে। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং তখনকার সামন্ত সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তাঁর সন্তানদের তিনি সুশিক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চানমনি চাকমা ও সুন্দরপুদি চাকমার জ্যেষ্ঠ ছেলে কৃষ্ণ কিশোর চাকমা তৎকালীন সময়ে জুম্ম সমাজের তৃতীয় বিএ ডিগ্রীধারী ব্যক্তি, তবে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা 'স্কুল ইন্সপেক্টর' হিসেবে চাকরি নেয়ার পর পার্বত্য এলাকায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, নানাভাবে জুম্মদের শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন ও সহযোগিতা দেন। যেকারণে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলনে পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিতি পান এবং এখনও অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন।

চিত্ত কিশোর চাকমা ছোট মহাপুরম নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা পায় যুবরাজ দেওয়ান নামে এক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে। গ্রামের এই স্কুল থেকেই চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পাহাড়তলীর মহামুনি হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন ও ১৯৩০ সালে এই বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আইএ ভর্তি হন। এখানে পড়তে পড়তেই একসময় বাড়িতে তাঁর মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে ফিরে আসেন। মা মারা যাওয়ার পর তিনি আর কলেজে ফিরে যাননি এবং ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে একসময় খাগড়াছড়ির খবংপয্যা গ্রামের বাসিন্দা রমেশ চন্দ্র দেওয়ানের জ্যেষ্ঠ কন্যা সুভাষিণী দেওয়ানের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতি টানার পর তিনি নিজেরই গ্রামে ছোট মহাপুরম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ স্কুলটিই পরে জুনিয়র হাই স্কুলে উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি পশ্চিম বাংলার বহরমপুরের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ভার্নেকুলার ট্রেনিং গ্রহণ করেন। দূরাগত ছাত্রদের অসুবিধার কথা ভেবে স্কুলের পাশেই বোর্ডিং (ছাত্রাবাস) চালু করেন। স্কুলের বাইরে সেখানে ছাত্রদের পড়াতেন এবং পড়ালেখার তদারকি করতেন। এই স্কুলেই তাঁর সন্তানরা এবং আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করেন, যারা পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সমাজে অনেক উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন।

তিনি জ্ঞানপিপাসু, প্রগতিশীল ও সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর জীবনাচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা, কর্মকান্ড ও সাহিত্য চর্চা থেকেও। তিনি চাকমা জাতির ইতিহাস ও ভাষা সম্পর্কেও লিখেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির যে দলীয় সঙ্গীত–'নববর্ষের আজি এ পুণ্য লগনে/ নিঃস্ব জগতে মহাজীবনের বোধনে/ জাতীয় জীবনে জাগো হে/ জুম্ম জাতি জাগো (২)/ গাও সবে জীবনের জয়গান॥....'– সেটি তাঁর

কালজয়ী এক রচনা। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় নাম ধারণ করে প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করলেও তিনি বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি' পুস্তিকায় লিখেছেন 'পৃথিবী নিত্য পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনধর্মী সংসারে জ্ঞান-বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হয়। নহেত মানুষ আদিম হইয়াই থাকিত।' পরিসরে ছোট হলেও গ্রন্থটির পাতায় পাতায় তাঁর জন্মভূমি-মাতৃভূমি, স্বজাতি ও নিজের পূর্বপুরষদের প্রতি গভীর প্রেম ও মমতা প্রকাশ পায়।

মহান এই ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে কাপ্তাই বাঁধের পানি আসার পর, যখন ইতোমধ্যে তাঁর পরিবার চলে গেছে পানছড়িতে নতুন আশ্রয়স্থলে, ঘরসংসার ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই স্কুল তলিয়ে গেছে হ্রদের পানিতে। তিনি একা স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে পড়ে রয়েছেন জন্মভূমি ও পিতামাতার স্মৃতির মায়াজালে, শেকড়ের টানে। উল্লেখ্য যে, কাপ্তাই বাঁধের পানি আসে ১৯৬০ সালের দিকে। পানির আসার পর চিত্ত কিশোর চাকমা মহাপুরম থেকে একটু দূরে মাছছড়ি দোর এর অভিমন্যু ঘাট নামক স্থানে একটি কুটির নির্মাণ করেন। ঐ অভিমন্যু ঘাটে নির্মিত কুটিরকেই তিনি তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেছে নেন। কুটিরটি নির্মিত হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে তাঁর সাথে থাকা ও পড়ালেখার জন্য নিয়ে আসেন। আমার মাকে তো অনেক আগে হারিয়েছি। তাই আমি সোৎসাহে চলে আসি। পরে অবশ্য আমার সাথে আরও তিন জন ছাত্র যোগ দেয়।

আর পানি আসায় মহাপূরম স্কুলটিও তিনি স্থানান্তর করে প্রথমে কৃষ্ণমাছড়া এলাকায় নিয়ে যান। বসন্ত কুমার চাকমা নামের এক গেরস্থের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে দোচালা করে অস্থায়ীভাবে স্কুলটি নির্মাণ করেন। স্কুলটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে ১৮-১৯ জন ছাত্র আসা শুরু করে। কৃষ্ণমাছড়ায় প্রায় দুই/তিন বছর পরিচালনার পর স্কুলটি তিনি স্থানান্তর করে নিয়ে যান রামহরি পাড়ায়। স্কুলটি রামহরি পাড়ায় নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তিনিসহ তিন জন শিক্ষক হন। যথারীতি তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আরও দুই শিক্ষক হলেন শান্তি বিকাশ চাকমা (শান্তি মাস্টার) ও আমার কাকা বিজয় কুমার চাকমা। আমি তখনও তাঁর সাথে তাঁর কুটিরেই থাকতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম এবং সেখান থেকেই স্কুলে লেখাপড়া করতাম। আমরা একসঙ্গে নৌকাযোগে স্কুলে যাতায়াত করতাম। বাড়ির ঘাট থেকে নৌকায় কিছু দূর যাওয়ার পর নৌকাটি ভিড়িয়ে আরও প্রায় তিন কিলোমিটার আমরা একসঙ্গে হেঁটে গিয়ে তবেই স্কুলে পৌঁছতাম। আমি দেখেছি, স্কুলের কোন ছাত্র টাকার অভাবে বেতন দিতে না পারলেও তিনি ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দিতেন। আর নিজেও তিনি প্রায় বিনাবেতনেই তাঁর দায়িত্ব পালন করে যেতেন।

আমি সেখানে থাকার সময় ১৯৬২-৬৩ এর দিকে খুব সকালে একবার তিনি, নমহরি চাকমা (আমার শ্রেণি সহপাঠি, বাড়ি ছিল রামহরি পাড়ায়) ও আমাকে নিয়ে ঘিলাছড়ির থুমে কেরেতকাবা নামক স্থানে যান। সেখানে এক ছোট মোনঘরে উঠি। সাথে ভাতমজাও (ভাত আর তরকারি একসঙ্গে কলাপাতায় মুড়ে) নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে তিনি পাহাড়ি এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখান। জানান, এখানেই আমাদের বাবা-মা, দাদু-দাদীরা ছিলেন। সেখানে গিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, যেন কোন কিছু খুঁজছেন আর গলা ছেড়ে চিৎকার করে বাবা-মাকে ডাকতে থাকেন– 'ও মাও, ও বাও' বলে, যেন তাঁর বাবা আর মা এখনই কোথাও থেকে ছুটে আসবে তাঁর ডাক শুনে। এখন উপলব্ধি করতে পারি এর পেছনে তাঁর কত আবেগ ছিল, কিন্তু আমরা তখন তাঁর আবেগ-অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারিনি। বস্তুত পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির প্রতি তাঁর গভীর আবেগী ও তীব্র টানই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এতে তাঁর জন্মভূমি, মাতৃভূমি, পিতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ পায়।

তাঁর শিক্ষক জীবনে সেই কুটিরে আমরা যখন একসঙ্গে থাকতাম তখন আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। আমরা যে কুটিরে থাকতাম সেখানে তিনি যখন মাটিতে আঙ্গুলের মৃদু টোকা দিয়ে 'খুত্খুত্' শব্দ করে ডাকতেন তখন আপনাআপনি দুটি ইঁদুর ও একটি চেরা (বৃশ্চিক জাতীয় ক্ষুদ্র বিষাক্ত প্রাণী) চলে আসত এবং খাবার খাওয়াত। কিন্তু আমরা যদি 'খুত্খুত্' শব্দ করি সেগুলো ভুলেও আসে না। আর প্রায়ই তিনি 'অয় অয়' করে ডাকতেন, এতে অনেক পাখি চলে আসত। পাখিদের তিনি খাবার দিতেন। এধরনের একাধিক ঘটনা রয়েছে। মনে হয় যেন, চারিদিকের পরিবেশ ও পশু-পাখিদের সাথেও তাঁর একটা গভীর সম্পর্ক ছিল।

দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি। স্বাভাবিক জীবনের সুবাদে ১৯৯৮ সালের দিকে খাগড়াছড়িতে আবার দেখা হওয়ার সুযোগ হয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চিত্ত কিশোর চাকমার সাথে। তখন তিনি মহাস্থবির। তিনি এসেছেন দীঘিনালার বোয়ালখালি বনবিহার থেকে। বয়সের ভারে তিনি এখন জর্জরিত, বেশ অসুস্থও। বেশি দিন টিকতে পারলেন না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁর ছোট ছেলে সন্তু লারমা দেশে ছিলেন না। তিনি সেসময় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন। শেষ ক'টা দিন শিক্ষাগুরু চিত্ত কিশোর চাকমার পাশে থাকার সুযোগ হয়েছে আমার। কিন্তু বার্ধক্য আর অসুস্থতা তাকে তেমন কথা বলতে দেয়নি। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধীর-স্থিরভাবেই ছিলেন। তিনি অনেকটা নীরবে চলে গেলেন।

অথচ এক সময় কত কী করেছেন! সমাজের জন্য, জাতির জন্য। কত ছাত্রের জীবনে তিনি শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছিলেন। জুম্ম জাতির মহান দুই নেতা প্রয়াত এম এন লারমা ও সন্তু লারমার সংগ্রামী চেতনা ও প্রগতিশীল নীতি-আদর্শের ভিত গড়ে উঠেছিল তাঁরই শিক্ষায় ও দিকনির্দেশনায়। ২০০০ সালের মে মাসে প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পিতা সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন, 'বাবা (চিত্ত কিশোর চাকমা) স্থানীয় জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তবে শুধু একজন শিক্ষকই নন, তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ, আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। আদর্শ পিতা হিসেবে আমার দৃষ্টিতে তিনি অতুলনীয়। তিনি শিল্পীমনেরও অধিকারী ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাবার জীবন-দর্শন আমার সমগ্র জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাবার হাতেই আমার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। বাবা ছিলেন আমার জন্মদাতা, শিক্ষাগুরু, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে বন্ধু, বিপ্লবী জীবনে পরম উপদেষ্টা।' সেই মহান ব্যক্তিকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রাম কিশোর চাকমার প্রয়াণ : আরেক সংগ্রামী জীবনের অবসান

॥ ধীর কুমার চাকমা ॥

সস্ত্রীক রাম কিশোর চাকমা'

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সোমবার দিবাগত রাতে রাঙ্গামাটি শহরের কালিন্দীপুরের অস্থায়ী বাসায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আজীবন সংগ্রামী ও নিরলস বিপ্লবী কর্মী রাম কিশোর চাকমার জীবনাবসান হয়। তিনি দলীয়ভাবে 'শংকর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ৭৩ বছর বয়সে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটে। ব্যক্তি জীবনে খুবই সাদাসিধে, কর্মঠ ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। জীবনের শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে পার্টির কাজে সক্রিয় থাকতে না পারলেও ছাত্র জীবন থেকে কর্মক্ষম থাকা অবধি তিনি জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং জীবন বাজি রেখে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগ্রামে অবিচল থেকে দলীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র, তিন নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। রেখে যান তার গুণমুগ্ধ অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও আত্মীয়-স্বজন। ব্যক্তি জীবনে রাম কিশোর চাকমা ছিলেন খুবই সহজ-সরল প্রকৃতির। হালকা পাতলা গড়ন, ফরসা চেহারা একমাথা কোকড়া চুল। স্বল্পভাষী, অকপট, অমায়িক, নিরহঙ্কারী ও সততার অধিকারী এই বিপ্লবী প্রয়াত রাম কিশোর চাকমা ওরফে শংকর।

বর্তমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের ভাঙামুড়া নামক এক নিভৃত গ্রামে রাম কিশোর চাকমার জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৩ জুলাই-এ। পিতা সোনা ধন চাকমা ও মাতা চন্দ্র তারা চাকমা। তিনি মা-বাবার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ সন্তান। বড় ভাই হরি কিশোর চাকমা, বড় বোন হরিপুদি চাকমা। তিনি যখন মায়ের গর্ভে তখন বাবা সোনা ধন চাকমা মারা যান। রাম কিশোর চাকমার বড় ভাই হরি কিশোর চাকমার বয়স তখন ৭ বছর। একান্নবর্তী পরিবার তাদের। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেঠা মেরেয়্যা চাকমা'র তত্ত্বাবধানে রাম কিশোরদের পরিবার কিছুদিন কেটেছিল। বাবার অকাল মৃত্যুর ফলে রাম কিশোরের বড় ভাই হরি কিশোর চাকমা (অরুণা বাপ) ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার পর আর পড়ালেখার সুযোগ পাননি। একটু বড় হলে বিধবা মা, ছোট ভাই রাম কিশোর এবং ছোট বোন হরিপুদিকে নিয়ে জ্যেঠা থেকে আলাদা হয়ে সংসারের হাল ধরেন দাদা হরি কিশোর।

নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট বাজারের পাশে চেঙ্গী নদীর পশ্চিম পড়ে বুড়িঘাট মিডল ইংলিশ স্কুল (এম. ই. স্কুল)। এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফিরোজ খান নুন হাতির পিঠে চড়ে রাঙ্গামাটি থেকে বুড়িঘাট সফরে যান। সফরকালীন সময়ে তিনি বুড়িঘাট এম. ই. স্কুল পরিদর্শন করেন এবং স্কুল উন্নয়ন উপলক্ষে স্কুলের তহবিলে নগদ অর্থ দান করেন। তখন থেকে তাঁর নামানুসারে স্কুলের নামকরণ হয় 'বুড়িঘাট ফিরোজ খান নুন এম. ই. স্কুল'। ১৯৫৫ সালে রাম কিশোর চাকমা এই স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে তখন চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হতো। এই স্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনি মাওরুম জুনিয়র হাই স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯৫৯ সালে। সেখানে মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ছিলেন মাওরুম জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মহাপুরুম জুনিয়র হাই স্কুলে (সম্ভবত) ১৯৬৩ সালে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

এর পর রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ৯ম শ্রেণিতে। ১৯৬৪ সালে মার্চ মাসে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৬৭ সালের মে মাসে আইএ পাশ করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ থেকে। উল্লেখ্য, রাম কিশোর চাকমা ছিলেন ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলা অন্তর্গত মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরিরত অবস্থায় ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন।

দাতকুপ্যার বীর লক্ষণ চাকমার (ইউপি মেম্বার) জ্যেষ্ঠ কন্যা মায়ারাণী চাকমার সাথে রাম কিশোর চাকমার বৈবাহিক সম্পর্ক হয় ১৯৭৬ সালে। তাদের সংসারে দুই কন্যা এক পুত্র সন্তান হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় কন্যা সুচিকা চাকমা বিএ, মেজো কন্যা চিজিপুদি চাকমা এসএসসি এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র ছোটমুণি চাকমা বিএসসি পাশ করেন। আর চিজিপুদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। কনিষ্ঠ পুত্র ছোটমুণি চাকমা বিএসসি পাশ করার পর আর পড়াশুনা করেননি।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে আইএ পরীক্ষা দেয়ার পর ১৯৬৭ সালে রাম কিশোর চাকমা দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করা এবং জুম্মদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য ষাট দশকে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাম কিশোর চাকমাও ১৯৬৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করার পর পরই দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলেও মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগ্রাম কাজ চালিয়ে নেয়া। তাই এ সময় জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির অন্যান্য কর্মীদের মতো তিনিও একাধারে শিক্ষকতা ও রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তীতে পরিস্থিতি সংঘাতময় হলে ১৯৭৭ সালে অন্যান্য সহযোদ্ধাদের মতো তিনিও শিক্ষকতার পদ ছেড়ে পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর আবার ২ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে তিনি মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে পুনঃযোগদান করেন। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে কয়েক মাস পর তিনি মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

ছাত্র জীবন থেকে রাম কিশোর চাকমা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। জুম্ম সমাজের উপর একদিকে সামন্তবাদী শোষণ-বঞ্চনা, অন্যদিকে বিজাতীয় নিপীড়ন-নির্যাতন সচেতন ছাত্র-যুব সমাজের অংশ হিসেবে তাঁকে বিদ্ধ করেছিল। ফলে এম এন লারমার জাতীয় সংগ্রামী ডাকে তিনিও সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। তাই তিনি একদিকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে জুম্ম জনগণের মাঝে জ্ঞানের আলো ফুটানোর জন্য শিক্ষকতা করেছেন, অন্যদিকে ঘুণেধরা জুম্ম সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার কাজেও সামিল হয়েছিলেন।

পার্টির বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে রাম কিশোর চাকমা ১৯৭৩ সাল থেকে মাইসছড়ি-ইটছড়ি অঞ্চলে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাইসছড়ি এলাকায় আঞ্চলিক কমিটিতে প্রথম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে আত্মগোপনে যাওয়ার পর ১৯৭৮ সালে পার্টির সদর দপ্তরে অন্যতম পরিচালক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগদানের পর কার্যালয়ের কার্যপরিধি বেড়ে যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত গৃহযুদ্ধের পর তিনি পরিবার কল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিবার কল্যাণ বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে তিনি ছিলেন খুবই নিয়মানুরাগী। পরিবারদের জন্য যার যার নির্ধারিত বরাদ্দ আছে তা যথযথভাবে বন্টন করতেন। ব্যারাকের জন্য যা যা নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ করা হয় সে সবই অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য কর্মীদের সচেতন করতেন। তাই পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মধ্যেই তাঁকে বেশি কাজ করতে হয়েছে। ১৯৮৪ সালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ৫ মার্চ ১৯৯৮ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এর পর দেশ ও জাতির স্বার্থে আবারো মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে পুনঃযোগদান করেন ২ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে। পুনঃযোগদানের পর তাঁর উচ্চ রক্ত চাপ দেখা দেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাধীনভাবে তাঁর পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হচ্ছিল না বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। তখন মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হন।

তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক আগে অসুস্থ অবস্থায় রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দেখতে এসেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনে শেষ বারের মতো পার্টির অফিসে আসা। গত শতকের ষাট দশকে শুরু হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গৌরবময় ৪৬ বছর পার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে মহান নেতা এম এন লারমা থেকে শুরু করে অনেককে হারিয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের বিগত ২০ বছরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অনেক বিপ্লবী বন্ধুকেও হারিয়েছি। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সম্মুখ সমরে, রোগে-শোকে, বন্দী অবস্থায় কারাগারে নিহত অনেক সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। রাম কিশোর চাকমার মৃত্যুতে পার্টি হারালো এক একনিষ্ঠ এবং অনুগত পার্টি সদস্যকে, যিনি কোনদিন শপথ বাক্য লঙ্ঘন করেননি। মহান এই নিভৃতচারী বিপ্লবীকে জানাই লাল সংগ্রামী সালাম।

স্মৃতিপটে ১০ নভেম্বর ও দুটো কথা

॥ ত্রিজিনাদ চাকমা ॥

১৯৮৬ সাল। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত নাজুক। রাষ্ট্রীয় শোষণ, বঞ্চনা আর জাতিগত নিপীড়ন, নির্যাতনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তখন অনেকটা দিশেহারা। সামরিক বাহিনী এবং সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও সহিংস আক্রমণের কারণে হাজার হাজার পাহাড়িকে উদ্বাস্তু এবং ১২,২২২ পাহাড়ি পরিবারকে প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে হয়েছে। এই চরম পরিস্থিতিতে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে অন্য অনেকের মত আত্মীয়-স্বজনসহ আমাদেরকেও পালাতে হয়েছে। এ সময় আমার বয়স চার বা পাঁচ হবে। এই ছোট্ট বয়সীও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত সহিংস আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ফলশ্রুতিতে আমাকে দীর্ঘ বহু বছর যাবৎ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরার ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে।

অতীতের দীর্ঘ এই কঠিন সময়ের অনেকগুলো স্মৃতির মধ্যে কিছু স্মৃতি অমলিন রয়ে গেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমার শৈশব, কৈশোর ও ১০ নভেম্বর। এগুলো যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। কারণ প্রতি বছর আমরা এ দিনটিকে স্মরণ করি, পালন করি। ১৫ সেপ্টেম্বর এম এন লারমার জন্ম দিবস না জানলেও ১০ নভেম্বরকে ঠিকই জানতাম, কারণ শরণার্থী শিবিরে এই একটি দিনই যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতো। শোক দিবসের পূর্ব দিন খুব ভোরে বড়দের সাথে আমরা ছোটরাও শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য বিভিন্ন ফুল ও পাতা বাহার সংগ্রহ অভিযানে নামতাম। দূর গ্রামের স্থানীয় উসুই, রিয়াং, দেববর্মা ও চাকমাদের বাড়ির আঙিনা থেকে গাদা, জবা, মোরগ ফুল ও বিভিন্ন ধরনের পাতা সংগ্রহ করতাম। বাঁশের বেতের কুন্ডলিতে এসমস্ত নানা ফুল ও পাতা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাতের মধ্যে সাজিয়ে রাখতাম। মাঝে সাদা কাগজের উপর লেখা থাকত- '১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি'। রাত পোহালেই ১০ নভেম্বর। তবুও আমাদের শিশু-কিশোর মন বুঝে উঠত না, তর সহ্য হতো না। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ১০ নভেম্বর এলে কালো ব্যাজ পড়ে ও খালি পায়ে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে কচ্ছপ গতিতে এগিয়ে গিয়ে সর্বস্তরের জনগণের সাথে আমরা ছাত্রছাত্রীরাও শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতাম। ভোর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের সুশৃঙ্খল লাইন। এতে স্কুলের শিক্ষকরাই নেতৃত্ব দিতেন। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হতো। স্কুলে নোটিশ দেওয়া হতো। ১০ নভেম্বর, জুম্ম জাতীয় জীবনের শোক দিবস। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার দিবস।

ঐদিন স্পীকারে ঘোষণা আসত, কে বা কারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছেন। শোকবার্তা আমাদের সকলের মাঝে প্রতিধ্বনিত হত। শহীদদের নাম একে একে ভেসে আসত। পিনপতন নীরবতায় আমরা শত শত অংশগ্রহণকারী তা মনোযোগ সহকারে শুনতাম। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের আত্মাহুতি এবং বীরত্বগাথা বক্তাদের কাছ থেকে শুনে আমাদের শিহরণ জাগত; জুম্ম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস সঞ্চারিত হত। আমাদের শিশু-কিশোরের শরীরে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যেত।

দিনশেষে, সন্ধ্যায় আমরা শহীদদের উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করতাম। ফানুসও ওড়াতাম। সংগ্রামের বড় প্রেরণা নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরতাম। পরদিন থেকেই আবার রুটিনমাফিক শরণার্থী জীবন। বছর ঘুরে আবার ১০ নভেম্বর। এভাবে দীর্ঘ বারটি বছর শরণার্থী শিবিরে জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন করেছি।

এরকম একটি পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই এম এন লারমা সম্পর্কে আমার কৌতুহল জন্ম হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' সম্পর্কে আরো বেশি আগ্রহ জন্মেছে। বড়দের কাছ থেকে শান্তিবাহিনীর বাস্তব গল্প শুনেছি। মা-মাতৃভূমি-মাতৃভাষা তথা জাতীয় অস্তিত্বের জন্য তারা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ করছে। গেরিলা কায়দায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করছে। সরকারকে চাপ প্রয়োগ করছে। এগুলো শুনে আমি এম এন লারমা ও শান্তিবাহিনী যোদ্ধাদের আমার শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখতাম। এ দুর্বলতা থেকে শান্তিবাহিনীকে স্বচক্ষে দেখার উদগ্র বাসনা জাগতে থাকে। আমরা শুনেছি যে, কালো রাতের সেই ঘটনার স্থানেও শান্তিবাহিনীদের দ্বারা শোক দিবস পালন করা হয়। এম এন লারমাকে কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। সেই বাস্তবতাও নেই। তবে নেতা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের স্মৃতির পুন্যস্থান এখনো রয়ে গেছে এবং প্রতি বছর ১০ নভেম্বরে সেখানে তাঁদের স্মরণে শোক পালন করা হয়। মূল শ্মশানে শহীদদের প্রত্যক্ষভাবে গভীর শ্রদ্ধা জানানোর এটাই শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

সালটা মনে নেই। সম্ভবত ১৯৯৩ বা ১৯৯৪। আমি তখন ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবির উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ঐ বছর আমরা শিবিরের বড় ভাই, বন্ধু-বান্ধব ঠিক করেছিলাম এবার আমরাও শান্তিবাহিনীদের সাথে মূল শ্মশানে শোক দিবস পালন করবো। বড় ভাইরা সম্ভবত আগে থেকেই যোগাযোগ করে রেখেছে। পরিবার থেকেও অনুমতি মিলল।

সেদিন খুব ভোরে সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে আসার আগে আগেই অন্ধকারের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা শিবির থেকে পায়ে হাঁটা শুরু করি। খালি পা, কারণ আজ আমাদের শোক দিবস। তাই আমরা মনে করতাম সারাদিন জুতা-স্যান্ডেল পায়ে দেওয়া যাবে না। মেঠো পথ আর আঁকাবাঁকা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় চলার পথে আমাদের অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তখন আমাদের মাঝে একটা কথা প্রচলন ছিল যে, শোক দিবসে অবশ্যই বৃষ্টি হবে। বেশি না হলেও অন্তত একটু একটু দিতে

বাধ্য। কারণ সবাই বলাবলি করত যে, নেতার মৃত্যু আকাশ, বাতাস, পৃথিবী মেনে নিতে পারেনি। তাই এদিনে আকাশকে কেঁদে দিতে হয়। যা হোক, কষ্ট হলেও আমরা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলেছি। এই ইজেরে ছড়ার উজান বেয়ে আমাদের সেই কাঙ্খিত গন্তব্যে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার খেদারাছড়ার থুমে পৌঁছাতে হবে।

বিরতিহীন এই পথচলায় আমাদের লক্ষ্য একটাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। তাই ঘন ঘন এই ছড়া পার হওয়া আর পিচ্ছিল পথ আমাদেরকে দমাতে পারেনি। দীর্ঘ পাহাড়ি বন্ধুর পথও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আমরা সমান তালে এগিয়ে চলেছি। পথিমধ্যে জঙ্গলের আড়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর আমরা শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র টহল দেখতে পেয়েছি। সবুজ পাতা রঙের শান্তিবাহিনী যেন জঙ্গলের সাথে মিশে গিয়েছে। জীবনে প্রথমবার শান্তিবাহিনী দেখতে পেয়ে শরীরে কি রকম যে উত্তেজনা তা বলে বুঝানো কঠিন। মনে মনে ভাবছি, যাক একটা স্বপ্ন পূরণ হলো। এখন শুধু আরেকটাই বাকি। এম এন লারমা ও তাঁর সাথে শহীদ হওয়া সহযোদ্ধাদের সমাধির কাছাকাছি যাওয়া! যা অল্প কিছুক্ষণের পরেই পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

যাক, আমরা যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম। আমাদেরকে কালো ব্যাজ দেওয়া হলো। সবকিছুই প্রস্তুত। পরক্ষণেই শুরু হলো শহীদদের উদ্দেশ্যে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র গার্ড অব অনার। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলাম। শহীদদের বেদী, পাতা রঙের শান্তিবাহিনী ও তাঁদের অস্ত্র দেখে আমাদের এতক্ষণের ক্লান্তি ও ক্ষুধা উবে গেছে। সামরিক কায়দায় শ্রদ্ধা জানানো হলো। শহীদদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করা হলো। বিভেদপন্থীদের ঘৃণাভরে ধিক্কার জানানো হলো। আমরাও মহান নেতা এম এন লারমা ও তাঁর সঙ্গে আত্মাহুতি দেওয়া বীর সহযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানালাম এবং মনে মনে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রকে গালি দিতে লাগলাম। আফসোস লাগলো যে নেতাকে এত অল্প সময়ে আমাদের হারাতে হলো। তাই চার কুচক্রীর জন্য বেশি বেশি ক্ষোভ জন্ম নিলো। জাতীয় বেঈমানরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে জাতির বড় ক্ষতি সাধন করলো। অনুষ্ঠানের উত্তেজনায় ইতিহাসের এ বাস্তবতা আমার মাথায় বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল। যা হোক, এভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। ঘন্টা দেড়েকের অনুষ্ঠান শেষে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বাঁশের বড় বড় ঝুড়িতে করে আমাদের জন্য সেমে আলু সিদ্ধ নিয়ে আসলো এবং তারা একজনকে দুটো করে আলু ভাগ করে দিলো। আমরা দেরি না করেই ফিরতি পথে রওনা দিলাম যেহেতু আমাদেরকে অনেক পথ হাঁটতে হবে। আলু পেয়ে এখন আমাদের ক্ষুধা আরো তীব্র হয়েছে। আমরা খাচ্ছি আর হাঁটছি। বেশ সন্তুষ্ট মনে আজকের দিনের অভিজ্ঞতা বলাবলি করে সমানে এগিয়ে যাচ্ছি। পুরো পথজুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তু আজকের অনুষ্ঠান, শান্তিবাহিনী ও আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। আমরা বেশ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই শরণার্থী শিবিরে পৌঁছি। ১০ নভেম্বরকে নিয়ে এই স্মৃতি আমার মানসপটে জ্বলজ্বল করে এখনো অক্ষয় রয়ে গেছে।

জুম্ম জাতির কর্ণধার হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আমরা সবাই কম বেশি চিনি, জানি। তাঁর জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। মৃত্যু ১০ নভেম্বর, ১৯৮৩। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র চুয়াল্লিশ বছর এক মাস ছাব্বিশ দিন। ক্ষণজন্মা এই মানুষটি এই অল্প সময়কালেও শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর নিপীড়িত-নির্যাতিত-শোষিত-বঞ্চিত-অধিকারহারা জাতির অনুপ্রেরণা ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা জানি, তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। কিন্তু সেটা বর্তমান সময়ের চাকরি হিসেবে নয় বরং দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি নিজেই কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, শ্রম দিয়েছেন ও শিক্ষকতার মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অন্ধকারে আলো জ্বেলেছেন।

তিনি একসময় এলএলবি পাশ করেন। চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের সদস্য পদও লাভ করেন। কিন্তু আদালত প্রাঙ্গণে তাঁর মন বসেনি। আইন ব্যবসা সকল সময়ে জমজমাট একটি ব্যবসা ছিল। এখানে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৈষয়িক স্বার্থ চরিতার্থ করা যেত। কিন্তু আজন্ম নির্লোভ এই মহাপুরুষকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন প্রকার ভোগবাদ আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও মহান জাতীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গতানুগতিক ধারার পথ মাড়াননি। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তিনি দুর্নীতির আশ্রয় নেননি। অট্টালিকা ও সম্পদ গড়ার প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল না। অথচ বর্তমান সময়ে এটাই নির্মম বাস্তবতা।

উপরোক্ত কোন কাজেই তিনি মনোযোগী হতে পারেননি। কারণ সেগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী। তিনি দীর্ঘস্থায়ী অবদান বা প্রভাববিস্তারকারী কাজের জন্য উন্মুখ ছিলেন। তিনি জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যত নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ছিলেন। বিজাতীয় শাসন-শোষণ ও সম্প্রসারণবাদের কারণে দ্রুত অবলুপ্তির পথে ধাবমান জুম্ম জাতিকে নিয়ে তিনি সবসময় চিন্তিত ছিলেন। তাই জাতীয় মুক্তিকে তিনি সবার আগে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ কাজকে তিনি জীবনের সবচাইতে মহান ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। একারণে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন এবং জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এর পরের ইতিহাস আমরা কমবেশি সবাই জানি।

চুয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত বয়সকে যৌবন হিসেবে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এম এন লারমা'র বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও সংগ্রাম এ বয়সে সম্পন্ন হয়েছে। এ বয়সেই তিনি অসাধ্যকে সাধন করেছেন। অধিকারবঞ্চিত জুম্ম জাতির মুক্তির পথকে সুপ্রশস্ত করেছেন। এর জন্য নিজের অমূল্য জীবনকেও উৎসর্গ করেছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে- তাঁর জীবন ও সংগ্রাম থেকে আমরা বর্তমান তরুণ প্রজন্ম কী শিক্ষা নিয়েছি বা নিতে পেরেছি। যে নেতা তৎকালীন সময়ে উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য চাকরির অভাব না থাকলেও চাকরিকে জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেননি, আইন পেশাকে টাকার মেশিন বানাননি, সংসদ সদস্য পদকে ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের সিঁড়ি হিসেবে দেখেননি, যে নেতা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত-নির্যাতিত-অধিকারহারা ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য ব্যয় করেছেন, তাদের জন্য কঠিন কষ্ট ভোগ ও অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন সেই

অসাধারণ নেতার কাছ থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? আমি মনে করি, সময়ের বাস্তবতায় বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে এর সমাধান খুঁজে পেতে হবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ের আকাশ সংস্কৃতি ও ভোগবাদের নগ্ন থাবায় তরুণ সমাজের সহজাত বৈশিষ্ট্য আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। মুনাফালোভী পুঁজিবাদের করালগ্রাস তরুণ সমাজের অধিকাংশ চেতনাহীন জড় পদার্থে পরিণত করেছে। তাদের বোধশক্তি আজ মুখ থুবরে পড়েছে। ব্যক্তি স্বার্থপরতায় তারা অন্ধ হয়ে পড়েছে; ন্যায়-অন্যায় বেমালুম ভুলে গেছে। আজ তাদেরকে চিন্তার দাসত্ব পেয়ে বসেছে। তাদের মুখে মুখে এখন- আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ফেইসবুক প্রোফাইলে তারা জুড়ে দেয়- I hate politics! তাইতো আজ তারা বিসিএসকে জীবনের প্রধান পাওয়া মনে করে; কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকরিকে বিরাট সম্মানের মনে করে; ঘুষের চাকরিকে নিয়ে গর্ববোধ করে। একারণে জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর দালালীপনা করাও তাদের শখে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে সমাজের জন্য কাজ করা মানে অনর্থক সময় নষ্ট করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভাবা মানে শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়া। তাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচাই হচ্ছে তাদের শ্রেণির প্রধান চরিত্র।

কিন্তু এভাবেই কি মুক্তি সম্ভব? সেটা ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি যাই হোক। এম এন লারমার সময়কার পরিস্থিতি এবং বর্তমান সময়কার পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির মধ্যে কোন ফারাক নেই। বরং বর্তমান পরিস্থিতি আরো বেশি চরম আকার ধারণ করেছে। তথাকথিত উন্নয়নের নামে জুম্মদের হাজার হাজার একর জায়গা জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সামরিক বাহিনী কর্তৃক পর্যটন ও ক্যাম্প স্থাপনের কারণে শত শত জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। বান্দরবানে ব্যক্তি ও কোম্পানির নামে (কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, লাদেন গ্রুপ ইত্যাদি) শত শত একর জমি লীজ দিয়ে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের বাস্তুচ্যুত ও ভূমিহীনে পরিণত করা হচ্ছে। বহিরাগত অনুপ্রবেশ তো চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় জুম্ম জনগণ দিন দিন সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। তারা আজ নিজদেশে পরবাসী। তাদের জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই। তাদের মানবাধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত। সংগঠন করার অধিকার নেই। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন জুম্ম জনগণের কণ্ঠকে রোধ করে দিতে চায়। নানা অজুহাতে জুম্মদের উপর দমন-পীড়ন ও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

পার্বত্যবাসীর অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে তার জন্য নানা ষড়যন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন বাস্তবায়ন করে চলেছে। চুক্তি বাস্তবায়ন তো দূরের কথা বরং উল্টো এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনকারীদের নানাভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, দমন ও কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে লেবেল দেয়া হচ্ছে। মা-বোনদের কোন নিরাপত্তা নেই। নারী নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটনার বিচার হয় না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে বারবার উসকে দিচ্ছে। এখানে আগের তুলনায় অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে দমন-পীড়ন বেড়েছে। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। রমেল হত্যা ঘটনা। যে অর্ধ-প্রতিবন্ধী ছাত্রকে মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন এবং মৃত্যু যাত্রায় নিক্ষেপ করা হলো, সে রমেলের লাশ তার আপন পরিবার ফেরত পাইনি। প্রথাগত নিয়মে লাশের সৎকার করতে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় বাহিনীরাই পেট্রল ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছে! সর্বশেষ, সেনা-পুলিশের প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ২ জুনের লংগদুর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা পাহাড়ের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দেয়? এখনো বলা হবে, আমরা ভালো আছি? চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দালালী করে সুখে আছি? ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় মগ্ন থেকেও এ ব্যবস্থা থেকে রেহাই পাচ্ছি?

স্বার্থপরতায়, আত্মকেন্দ্রিকতায়, সুবিধাবাদে আমরা এতই অন্ধ হয়েছি আমাদের সন্তান-সন্তুতি তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের কথাও ভুলে গেছি। বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হয়ে সন্তান-সন্ততিদের সুখের কথা ভেবে যে সহায় সম্পদ ও অর্থকড়ির পেছনে দৌড়াচ্ছি সেই সহায় সম্পদ ও অর্থকড়ি কি সেই সন্তান-সন্ততিরা ভোগ করতে পারার নিশ্চয়তা আছে? নিবিষ্ট চিত্তে গভীরভাবে কি এসব ভেবে দেখেছি? যে শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে তার ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় সন্তান-সন্ততি তথা ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমরা নিরাপত্তাহীনতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নিজের জীবদ্দশায় নিজের কর্ম দিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে চলেছি।

এম এন লারমা চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দালালী, ব্যক্তি স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদিতে সুখ খুঁজে পাননি। বৈষয়িক কোন কিছুই তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। ভোগবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। একার উন্নতিকে তিনি গুরুত্ব দেননি। তিনি সকলের মাঝে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। জাতি বাঁচলে ব্যক্তি বাঁচবে আর জাতি ধ্বংস হলে ব্যক্তিও হারিয়ে যাবে। এই ধারণা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই জাতির মুক্তি তাঁর কাছে প্রধান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি অনেক কষ্ট, ত্যাগ, তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন। কারাভোগ করেছেন। জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এম এন লারমা ও তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত তৎকালীন ছাত্র-যুব সমাজ সময়ের দাবি মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। ভীতু জাতিকে সাহসী করে গড়ে তুলেছেন। ঘুনেধরা ও ঘুমন্ত সমাজকে এতটুকু বিকশিত করেছেন। জাতির বর্তমান ক্রান্তিলগ্নেও ছাত্র-যুব সমাজের তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের বাস্তবতা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদিতা এবং ভোগবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আমরা বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজ সেই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত কি? আমরা কি জাতীয় মুক্তিকে সবার আগে অগ্রাধিকার দিতে পারি? আমরা কি জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্বের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে পারি? ১০ নভেম্বরের এই দিনে আমাদের তাই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন; গভীর অনুভূতির প্রয়োজন। আসুন, আমরা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধি করি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করি।

জুম্ম তরুণ সমাজের চেতনায় এম এন লারমা

॥ বাচ্চু চাকমা ॥

১০ই নভেম্বর। এই দিনে মহান বিপ্লবী, জুম্ম জাতির পথ প্রদর্শক, শ্রমজীবী মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু, জুম্ম জাতির অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) চার কুচক্রী বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের হাতে নির্মমভাবে অকাল নিহত হন। আজ এমন একটি দিন, যে দিনটি জুম্ম জাতীয় জীবনে শোকের দিন। তবে এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে ইস্পাত-কঠিন আন্দোলন সংগঠিত করে এগিয়ে যাওয়ার একটি অন্যতম দিন। এই দিনে জুম্ম জাতির তরুণেরা কী ভাবছে, সেটি জানার ইচ্ছে জাগে। প্রিয়নেতার আদর্শকে তরুণদের প্রাণে-প্রাণে ছড়িয়ে দিতে স্বপ্ন দেখি। প্রশ্ন জাগে, জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য যিনি জীবন দিলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি আজীবন লড়েছিলেন, সেই এম এন লারমার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে যুব সমাজে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় কিনা।

এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই অস্তিত্ব রক্ষার, এই লড়াই অধিকারের- এই মর্মার্থ মনের গভীরে জন্ম হওয়ার পর ৭০ দশকে হাজারো তরুণ ছাত্র ও যুব শক্তি জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হয় মৃত্যু, না হয় বিজয়- এই দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে একদল তারুণ্যের শক্তি পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়ের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মহান নেতার আদর্শের সৈনিক হয়ে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সফলভাবে চালিয়ে গেছেন। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোয়ারের এক পর্যায়ে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে রেখে যাওয়া 'ভাগ করো, শাসন করো'- এই নীতির ভিত্তিতে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে বিভেদপন্থী চক্র মহান নেতা এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। মহান নেতাকে হত্যা করলেও তাঁর চিন্তা চেতনা ও সুমহান আদর্শকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেহনতি মানুষের অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। বরং আজকে এটাই বলতে ইচ্ছে করে 'ইতিহাস তুমি কেঁদো না, পরিবর্তন আসে, চির ক্লান্তি ভাবনা তোমাকেই ভালোবাসে।' এটাই বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর! ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে প্রমাণ মেলেছে ইতিহাস কখনও কাউকে ক্ষমা করে না। জুম্ম জাতির পিতার সাথে বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা বাস্তব সত্যেই প্রমাণিত হয়েছে। সেই ইতিহাসের পথপরিক্রমায় বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রী আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

> “ ৭০ দশকে হাজারো তরুণ ছাত্র ও যুব শক্তি জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হয় মৃত্যু, না হয় বিজয়- এই দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে একদল তারুণ্যে শক্তি পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়ের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

বর্তমান নেতা সন্তু লারমা জুম্ম তরুণ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছেন– 'জুম্ম ছাত্র সমাজকে দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদিতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে'। জুম্ম ছাত্র সমাজ এই নির্মম বাস্তবতাকে কতটুকু উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে পারে তা এখন অনাগত দিনে দেখার বিষয়। আমাদের জুম পাহাড় আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, পাহাড়ে নিরাপত্তা নেই, পাহাড়ে হাসি নেই, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমি অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে চলেছে। জুম্ম জনগণের বেঁচে থাকার একমাত্র ভিত্তি ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ২০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। চুক্তি বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ আজ আমরা দেখি না, বরং সরকারের নানা গরিমসি, কালক্ষেপণ, প্রতারণা আর মিথ্যার বুলি আওড়ানো ছাড়া জুম্ম জনগণ কিছুই লাভ করতে পারেনি।

আজকে এই বাস্তবতার সামনে পাহাড়ের জুম্ম তরুণ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হলে অসহযোগ আন্দোলনের দশদফার আলোকে আরো অধিকতর সংগ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই অধিকতর আন্দোলনে যেতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তরুণ ছাত্র সমাজ কি এখনও দোদুল্যমান? তরুণ ছাত্র সমাজ যদি সত্যিকারভাবে দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদিতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে জুম্ম জাতি বিজাতীয় শোষণ, নিপীড়ন থেকে মুক্তি অর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তারপরেও প্রয়াত নেতা এম এন লারমার আদর্শই সেখানে তরুণ সমাজকে নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আর কৌশতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির সংগ্রামের বাণী দৃঢ় কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন। তরুণ জুম্ম ছাত্র সমাজকে প্রিয়নেতার আদর্শ ও চিন্তাধারা থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

প্রিয়নেতার আদর্শ থেকে বাস্তবে শিক্ষা নিতে হলে কী ধরনের কাজ করা দরকার? প্রথমে রাজনৈতিকগতভাবে নিজেকে তৈরি করে গ্রামে চলো নীতি অনুসরণ করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি

মোন-মুরো, ছড়াছড়ি, গ্রামাঞ্চলের জুম্ম জনগণের কাছে তরুণ ছাত্র সমাজকে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এম এন লারমা একজন সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। সামন্তীয় সমাজের আকণ্ঠ নিমজ্জিত নির্মম বাস্তবতা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সামন্তীয় জুম্ম সমাজের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে এবং এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। জুম্ম জনগণের বেঁচে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন। পার্বত্যাঞ্চলে জুম্ম জনগণের নির্মম-নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র, ইসলামী সম্প্রসারণবাদের শোষণ, নিপীড়ন তাঁর অন্তরে আঘাতের পর আঘাত করেছে বারবার। প্রিয়নেতা তাঁর মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন– 'আমার রক্ত বিন্দু দিয়ে যদি জুম্ম জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে মেরে ফেলো, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত'!

“ মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদিতা, দালালীপনা, দোদুল্যমানতা ও সংকীর্ণতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন তিনি। বর্তমান চাকচিক্যময় ও রঙিন জগৎটাকে অন্তরে স্থান দিয়ে তরুণ ছাত্র সমাজ কিভাবে প্রিয়নেতার আদর্শকে গ্রহণ করবে? তারুণ্যের ভরপুর জুম্ম জাতির অগ্রগামী অংশকে নিয়ে এখনও স্বপ্ন দেখি-স্বপ্ন বুনে চলেছি। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এই তরুণেরা জুম্ম জাতির সত্যিকার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার লক্ষ্যভেদ করে ছাড়বেই। শাসকগোষ্ঠীর কাছে মহান নেতার আদর্শ কখনও হার মানেনি, আপোষ করেনি, পরাজয় স্বীকার করেনি!

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদিতা, দালালীপনা, দোদুল্যমানতা ও সংকীর্ণতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন তিনি। বর্তমান চাকচিক্যময় ও রঙিন জগৎটাকে অন্তরে স্থান দিয়ে তরুণ ছাত্র সমাজ কিভাবে প্রিয়নেতার আদর্শকে গ্রহণ করবে? আমি তারুণ্যের গান গেয়ে যাই, তারুণ্যে ভরপুর জুম্ম জাতির অগ্রগামী অংশকে নিয়ে এখনও স্বপ্ন দেখি-স্বপ্ন বুনে চলেছি। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এই তরুণেরা জুম্ম জাতির সত্যিকার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার লক্ষ্যভেদ করে ছাড়বেই। শাসকগোষ্ঠীর কাছে মহান নেতার আদর্শ কখনও হার মানেনি, আপোষ করেনি, পরাজয় স্বীকার করেনি!

মহাননেতার আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত প্রিয় সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কৌশলগতভাবে কখনও নমনীয় সংগ্রামের রূপে আবির্ভূত হয়েছে; আবার কখনও অধিকতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। জুম্ম জনগণের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ যেমন রূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনও সেভাবে আবর্তিত হয়েছে। প্রিয়নেতার আদর্শের ভাষায় বাস্তবমুখী বাস্তবতা, আত্মমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জুম্ম জনগণের প্রাণের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। যখন যে বাস্তবতা দেখা দেবে সেই বাস্তবতা অনুযায়ী জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকেও সেভাবে প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

মহাননেতার আদর্শকে চিনতে, জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। প্রথমে এই আদর্শকে চেনা ও চেনার পরে তা মেনে চলা। এটি জানার পর নিজের মধ্যে বাস্তবে প্রয়োগ করে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা স্বপ্ন দেখি পাহাড়ের শিশু, কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিরাপদে বিচরণ করতে পারবো। স্বপ্ন দেখি আলুটিলা, ফুরমোন, কেওক্রডং পাহাড়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগের পর যুগ, সংগ্রামের প্রতীক রূপে বাস্তব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে। স্বপ্ন দেখি চেঙ্গী, মাইনী, কাচালং, কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুহুরী নদীগুলোর বহমান স্রোতধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন-বনানী, গাছ-গাছালী, ঘেরা-অরণ্যে ভরা সবুজ পাহাড়গুলো এম এন লারমার আপোষহীন লড়াই সংগ্রামের মহাকালের প্রেরণা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেবে এই মাটি, পাহাড়ের গাছ-গাছালী, অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, ছড়া, ঝিরি-ঝর্ণা সবক্ষেত্রেই এম এন লারমার জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বকে বাঁচাতে, পাহাড়ের জীবনকে সাজাতে প্রিয়নেতা আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর স্বপ্নের জুম্মল্যান্ড প্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি জুম্ম জনগোষ্ঠীকে আপন করে নিয়ে ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর উপর অন্যায় হতে দেখলে তাঁর মন অশান্তিতে ভরে যেতো। প্রতিবাদের ভাষা নিজেই খুঁজে নিতেন। তিনি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসী সৈনিক ছিলেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সেই সময়ের সামন্তীয় নেতৃত্ব প্রতিরোধ তো দূরের কথা প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। সেই সময়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন; কাপ্তাই বাঁধ এর বিপর্যয় সম্বন্ধে ছাত্র সমাজ ও জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমাকে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩ সালে নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেফতার করেছিলেন।

শাসকশ্রেণির অন্যায়ের কাছে তিনি কখনো কোনদিনই মাথানত করেননি। সেই তারুণ্যে ভরা এম এন লারমাকে দীর্ঘ ২ বছর কারাগারে অন্তরীণ রাখার পরেও শাসকগোষ্ঠী দমিয়ে রাখতে পারেনি।

একাই লড়ে গেলেন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

মহাননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবন যদি ফিরে দেখি তাহলে নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কাছে তা অত্যন্ত গৌরবের। ১৯৫৬ সালে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ ঘটেছিল। রাজনৈতিক জীবনে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম ছাত্র সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে প্রিয়নেতা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান, ১৯৬০ সালে গনতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং একই বছরে পাহাড়ি ছাত্র সমাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিতকরণ, ১৯৬২ সালে পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনের প্রধান দায়িত্ব পালন করার পর চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাস হতে ১৯৬৩ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করেছিলেন। দীর্ঘ ২ বছর জেলে অন্তরীণের পর ১৯৬৫ সালে ৮ মার্চ চট্টগ্রাম কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সবচেয়ে কম বয়সে, তারুণ্যে ভরা টগবগে যৌবনের সময়টাতে প্রথম জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দুই বছরের মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ১৯৭২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি ৪ দফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা পেশ করেছিলেন। একই বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সংঘবদ্ধ শক্তি সমাবেশ করে প্রতিষ্ঠা করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭৩ এর নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন এবং একই সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য এবং স্মরণীয় একটি দিন ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে জুম্মদেরকে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেছিলেন। জুম্ম জনগণের স্বার্থে কৌশলগতভাবে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর বাকশালে যোগদান করেছিলেন, পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে ১৬ আগষ্ট থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১ম জাতীয় সম্মেলন এবং সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে ২০ সেপ্টেম্বর প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও বিভেদপন্থী চক্রদের ষড়যন্ত্রকে দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ২য় সম্মেলন শুরু এবং সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশেষে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর ভোর রাতে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। মহাননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে কুচক্রীরা আর বাঁচতে দিলো না; সুদীর্ঘকাল ধরে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

জন্ম হলেই মানুষের মৃত্যু অবধারিত। একজন মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু একটি মানুষ যখন একটি আদর্শ বা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠে তখন তাকে শারীরিকভাবে হত্যা করা গেলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করা যায় না। জুম্ম জাতির মুক্তির পথ প্রদর্শক মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করা গেলেও তাঁর আদর্শ ও চিন্তা চেতনা আজো জুম্ম জনগণের কাছ থেকে মুছে দিতে পারেনি। তাঁর আদর্শকে বহন করে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পাহাড়ের বুকে আমাদের বীর সেনানীরা লড়াই করে চলেছে। নতুন সমাজ বিনির্মাণের জন্য যখন আমরা স্বপ্ন দেখবো, আমাদের এমন একটি আদর্শকে লালন করতে হবে- যে আদর্শের মৃত্যু নেই। যে আদর্শ পৃথিবীর বুকে অজেয় এবং সবচেয়ে প্রগতিশীল। যে আদর্শ মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেবে। যে আদর্শ ধনী, গরীব, উচু-নিচু, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না। অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে নিরন্তর, জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। মহৎ আদর্শের জন্য যারা লড়াই করে সমাজে তারা মরেও অমর। এই মর্মার্থ ও সারবস্তু জুম্ম তরুণ সমাজের চেতনায় এম এন লারমা যেন হয়ে উঠেন এক মুক্তির দিশারী।

‘আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ—কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।’

৩১ অক্টোবর ১৯৭২ ‘বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন’ সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবেব উপর গণপরিষদে প্রদত্ত এম এন লারমার ভাষণের অংশবিশেষ

কবিতা

শহীদ বেদীতে ফিরে আসি বারবার

॥ আনন্দ জ্যোতি চাকমা ॥

ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে শহীদ বেদী
গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তজবা হাস্নাহেনা গাদা শিউলি
কত অজানা ফুলের সমারোহে সুশোভিত
তোমাদের শেষ ঠিকানা প্রাণের শহীদ বেদী।।
প্রত্যুষে গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি আর
ঘন কুয়াশা-শিশিরে ভেজা বুনো পথে
ঢল নামে বেদনার্ত হৃদয়ের ব্যথিত মানুষগুলোর।।
শত থেকে সহস্র মানুষের দীর্ঘ নগ্ন পদযাত্রা
কালো ব্যাজ ধারণ করা প্রতিটি মানব মনের গভীরে
চেতনায়-বিশ্বাসে জায়গা করে নিয়েছো তোমরা।।
'শহীদ স্মৃতি অমর হোক'
'দশই নভেম্বরের চেতনা বৃথা যেতে দেব না'
আর কত কি শ্লোগান দেখেছি পুষ্পমাল্য গুলোতে;
শহীদ বেদীতে আসা প্রতিবাদী মানুষগুলো নীরবে
অশ্রুসিক্ত নয়নে, মলিন বদনে ঠাঁই দাঁড়িয়ে।।
প্রতিবাদে প্রতিরোধে ঘৃণায় ধিক্কারে
দগ্ধ তাদের অন্তরাত্মা।।
ওরা আমাকে অনেক বারণ করেছে, চোখ রাঙিয়েছে
মেশিনগান আর বেয়নেটের ভয় দেখিয়েছে,
আমি দমে যাইনি, গিয়েছি সদলবলে শহীদ বেদীতে
কারণ ওদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে-
খুনিরা আজ ভারমুক্ত, পুনর্বাসিত
মুখোশ তাদের উন্মোচিত;
কিন্তু জাতির কপোলে যে কলঙ্কের রেখা পড়েছে
তা কখনো মুছে যাবার নয়।।
কীর্তিমান বীর সেনারা
তোমাদের জানাই রক্তিম অভিবাদন;
শহীদ বেদীতে ফিরে আসি তাই বারবার।।

আমি ইতিহাসে দেখেছি

॥ ফেলাযেয়া চাকমা ॥

আমি ইতিহাসে দেখেছি
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে
ন্যায় জয়ী হয় না, স্বাধিকার পাওয়া যায় না।
কোন দেশের জাতিকে দাস বানালেও,
একদিন দাসরাই সংগ্রাম করে স্বদেশের মালিক হয়।
কারো অঞ্চল-রাজ্য জোর-দখল করলেও
প্রতিরোধের কারণে তা ফেরত দিয়ে চলে যেতে হয়।

আমি ইতিহাসে দেখেছি
বুট আর বেয়নেটের রাজত্ব বেশি দিন টিকে না।
যারা বিজাতিকে শোষণ-নিপীড়ন করে
তারা স্বজাতিকেও তাই করে।
আর যেখানে শোষণ-নিপীড়ন
সেখানে বিদ্রোহ সংগ্রাম বিপ্লব অনিবার্য।
নেতৃত্বও গড়ে উঠবেই।

আমি ইতিহাসে দেখেছি
সব সাম্রাজ্যের পতন হয়,
প্রচেষ্টায় উপনিবেশ আবার স্বাধীন হয়।
সবল প্রতিক্রিয়াশীলরা যুদ্ধ মহাযুদ্ধ বাধায়,
জনগণ, প্রগতিশীলরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
প্রতিরক্ষাযুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।
যারা সভ্য, আর্য, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র জাতি বলে দাবি করে
পরিণতিতে তারাই পরাজিত, হেয় হয়।

আমি ইতিহাসে দেখেছি
যে জাতির জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল নেই,
যে জাতি, সাহসী, সুশিক্ষিত, ঐক্যবদ্ধ নয়,
স্বাধিকার, সমঅধিকার, মানবাধিকারের জন্য
সংগ্রাম করে না, বুর্জোয়া, সামন্ত, আমলাদের
কাছে তারা বঞ্চিত, প্রতারিত, বিতাড়িত,
ধর্মান্তরিত, পরাধীন বা নিশ্চিহ্ন হয়।
এসব আমি ইতিহাসে দেখেছি।

প্রবন্ধ: বর্তমান পরিস্থিতি ও মানবাধিকার

পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিকতা ও জাতিগত নির্মূলীকরণ প্রসঙ্গে

।। সজীব চাকমা ।।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমেরিকান বামপন্থী লেখক মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক মহাদেশ দখল করেছে, নিপীড়ন চালিয়েছে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের উপর। আর সভ্যতার পর সভ্যতা ধ্বংস করেছে।' ষষ্ঠদশ শতাব্দী হতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ একের পর এক এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার প্রায় দেশে বা ভূখণ্ডে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। উপনিবেশ স্থাপন মানেই হল দুর্বলের উপর সবলের চাপিয়ে দেয়া নিপীড়ন, আধিপত্য ও পরাধীনতা। প্রায়ই ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সাথে জড়িয়ে থাকে– গণহত্যা, দাসত্ব, ধর্ষণ ও যৌন দাসত্ব, খুন-খারাবি, নির্যাতন, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, লোকের জোরপূর্বক উচ্ছেদ বা স্থানান্তর, অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন, আদিবাসী সংস্কৃতি ধ্বংসকরণ, পরিবারসমূহ বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি মানুষের প্রতি মানুষের চরম অবমাননা, অমানবিক আচরণ। এই ঔপনিবেশিক আধিপত্য দেখা দেয়–ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক, নয়া-ঔপনিবেশিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক, সম্প্রসারণবাদী, অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক ইত্যাদি নানা প্রকারে। এই উপমহাদেশের তথা আজকের পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ ভূখণ্ডেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ হিসেবে দুই শত বছরের নির্মম শোষণ-নির্যাতন-লুটপাটের কথা আমরা জানি।

> “নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যেটুকু হয়েছে তার থেকে আরও নির্মম ও জঘন্য কায়দায় এখানে ঔপনিবেশিকতা জারি রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে 'সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবেন' বলে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে রাষ্ট্র ও সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী উক্ত নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং নিজের দেশেরই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সেই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদ নির্মমভাবে প্রয়োগ করে থাকে। দেশের আদিবাসী জাতিসমূহ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে হয় দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, নয়তো চরম বৈষম্য, অবহেলা ও অপমানের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

উপমহাদেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হয়েছে সত্তর বছর হয়ে গেছে। আর বাংলাদেশ ধর্মীয় মৌলবাদী পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছে আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর হতে চলেছে। কিন্তু আমরা এদেশের জনগণ কি আদৌ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছি? আমরা কি বলতে পারি যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহসহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারছে? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যেটুকু হয়েছে তার থেকে আরও নির্মম ও জঘন্য কায়দায় এখানে ঔপনিবেশিকতা জারি রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে 'সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবেন' বলে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে রাষ্ট্র ও সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী উক্ত নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং নিজের দেশেরই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সেই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদ নির্মমভাবে প্রয়োগ করে থাকে। দেশের আদিবাসী জাতিসমূহ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে হয় দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, নয়তো চরম বৈষম্য, অবহেলা ও অপমানের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

বস্তুত ঔপনিবেশিক শক্তি বা সাম্রাজ্যবাদী কোন দেশ যে কায়দায় ভূমি, শ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি ও বাজার আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে অন্য একটি দেশের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি চাপিয়ে দেয়, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও ঠিক একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এটা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বলাবাহুল্য, এটি বিকৃত পুঁজিবাদেরই বা পুঁজিবাদের বৈকল্যতা বা দৈন্যতারই একটি

সুস্পষ্ট রূপ। যেখানে সরকার-শাসকগোষ্ঠী বা কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি নিজের দেশেরই পশ্চাদপদ ও অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর জাতিগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর উপর আগ্রাসন চালায়, তাদের সম্পদ, ভূমি, শ্রম, সংস্কৃতি ও অধিকার তথা সর্বস্ব কেড়ে নিতে চায়, তাদেরকে উৎখাত করতে চায়। বলাবাহুল্য, দেশের অপরাপর অঞ্চলে চলছে এক ধরনের শাসন, আর পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শাসন যা হলো সামরিক কর্তৃত্বাধীন শাসন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন থেকে শুরু করে সরকারি সকল বিভাগে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু। ব্যবসা-বাণিজ্যও মূলত বাঙালি বা বহিরাগত বাঙালিদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো চাইছে যে কোন অনৈতিক পন্থায়ই তাদেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। তদুদ্দেশ্যে গণহত্যা, হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, দমন-পীড়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী তথা উপনিবেশবাদীরা উগ্রজাতীয়তাবাদ, জাত্যভিমান, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং বিশেষত ইসলামী মৌলবাদের দ্বারা আকণ্ঠ পরিপুষ্ট তাই তারা আরও বেশি আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল।

এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং আদিবাসী জুম্মসহ স্থায়ী অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলেও সরকার-শাসকগোষ্ঠী তা বাস্তবায়নে গড়িমসি করছে। দীর্ঘ প্রায় বিশ বছরে চুক্তিটি যথাযথ বাস্তবায়নে সরকার যেমনি আন্তরিকতাহীন, তেমনি বর্তমানে বাস্তবায়ন তো দূরের কথা বরঞ্চ উপনিবেশিক কায়দায় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নানা উদ্যোগ গ্রহণে ও বাস্তবায়নে তৎপরতা বিরাজমান।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ শুধু ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে না, অধিকন্তু ইসলামী সম্প্রসারণবাদের কবলে পড়ে নিবিড় ও অব্যাহত এক জাতিগত নির্মূলীকরণের শিকারে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলার বা সবকিছু হারিয়ে ফেলার এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে IWGIA ২০১২ সালে 'Militarization in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh – The Slow Demise of the Region's Indigenous Peoples' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এম এন লারমা ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনিই পাকিস্তান আমলে এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে এই ঔপনিবেশিক ইসলামী সম্প্রসারণবাদের ব্যাপারে জুম্ম জাতির নেতৃত্ব ও জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং এজন্য তিনি জুম্ম জাতির রক্ষাকবচ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ চার দফা দাবিনামা সরকারের নিকট পেশ করেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার জুম্ম জাতির ন্যায্য অধিকার মেনে নিতে ব্যর্থ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় ইসলামী সম্প্রসারণবাদী শাসন-শোষণ এবং জোরদার হয়ে উঠে জাতিগত নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বিগত প্রায় ২০ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় সাম্প্রতিককালে তার মাত্রা আরও গভীর ও মারাত্মক রূপ লাভ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে একপ্রকার অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকেও চুক্তি বাস্তবায়ন বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকায় ব্যবহার করা হচ্ছে। সেনা ও সিভিল প্রশাসন প্রধানত চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা রেখে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা, আগ্রাসন, আধিপত্য তথা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অন্যতম একটি কারণ হল সরকারের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে এই জুম্মদের বিষয়ে যথাযথ ও সঠিক নীতিমালা বা দৃষ্টিভঙ্গি না থাকা অথবা তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা লালন বা পোষণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ভিন্ন সংস্কৃতির জাতিসমূহ দেশীয় প্রেক্ষাপটে নিজেদের সম্মিলিতভাবে জুম্ম বা স্বতন্ত্রভাবে পাংখোয়া, খুমী, লুসাই, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, অহমিয়া ও গুর্খা পরিচয় দিতে চায় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঐ পরিচয়ের পাশাপাশি তারা 'ইন্ডিজেনাস বা আদিবাসী' হিসেবেও পরিচয় লাভের অধিকারী। নিজের পরিচয় নিজে নির্ধারণের মৌলিক মানবাধিকারকে পদদলিত করে সরকার একতরফাভাবে এদের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ইত্যাদি পরিচয় চাপিয়ে দিতে চায়। এর মধ্য দিয়ে সরকার-শাসকগোষ্ঠী মূলত জুম্মদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বে পরিণত করে। সরকার জুম্মদের 'উপজাতি' হিসেবে পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে অধঃস্তন জাতি বা আদিম-অসভ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিহ্নিত করার পক্ষপাতি।

জুম্মদেরকে জাতিগত নির্মূলীকরণের সবচেয়ে ভয়াবহ পন্থা হল জুম্ম জাতিসমূহের ভূমি অধিকার অস্বীকার বা হরণ করা, তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা, তাদের ভূমি বেদখল, দখল বা ক্রয় করা। একদা ব্রিটিশ অধিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলটি আদিবাসী জুম্মদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য হিসেবেই ছিল। পরে ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণে গেলেও এই অঞ্চলটি শাসন বহির্ভূত এলাকার স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় এমন কেউ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ বা বসবাস করতে পারবে না বলে বিধান প্রণয়ন করে। গোটা ব্রিটিশ আমলে এই বিধান বলবৎ থাকে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসন আসার পরপরই সেই বিধানসহ অন্যান্য অধিকারগুলো একের পর এক খর্ব করা হয় এবং ৫০ দশক জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অস্বাভাবিক হারে বহিরাগত বাঙালি পুনর্বাসন করে আদিবাসীদের জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি দখলপূর্বক বন্দোবস্তী দেয়া হয়। ৬০ দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের ৫৪ হাজার একর

ধান্য জমিসহ পানিতে ডুবে যায়। প্রায় এক লক্ষ মানুষের বাস্তুভিটাও চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ১৯৭৫ সাল পরবর্তী একের পর এক সামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখলের মাত্রা অত্যন্ত নগ্নভাবে ও নজীরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। জানা যায়, ১৯৭৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে এক জনসভায় মেজর জেনারেল মঞ্জুর বলেন, 'যাদেরকে এই জেলায় পুনর্বাসন করা হচ্ছে তারা গরীব ও ভূমিহীন। তাদেরকে আশ্রয় দিতে হবে।'

১৯৮৩ সালে ন্যাশনাল কমিশন ফর জাসটিস এন্ড পিস, ঢাকা কর্তৃক বান্দরবান এলাকায় ভূমি সমস্যা বিষয়ে 'দ্য ল্যান্ড প্রবলেম অব হিল ট্রাইবালস' শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে (ক) বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ, (খ) ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে জমি বেদখল ও (গ) জবরদখল–এই তিনটি প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জুম্মরা তাদের ভূমি হারাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। বলাবাহুল্য, এখনও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং আরও নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। ১৯৮০ দশকে একদিকে বিপুল সংখ্যক সেটেলার বাঙালিকে বসতিপ্রদানের উদ্দেশ্যে জুম্মদের হাজার হাজার একর ভূমি বেদখল করা হয়, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের নামে ফলের বাগান, ক্যাসাবা চাষ, রাবার চাষ, গবাদি পশু পালন ও খামার স্থাপন, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি করার জন্য জুম্মদের শত শত একর ভূমি বেআইনীভাবে বন্দোবস্তী বা লিজ দেয়া হয়। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর জন্য বহিরাগতদের নিকট প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি লীজ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় সামরিক উদ্দেশ্যে ৭১,৮৭৭.৪৫ একর জমি অধিগ্রহণ বা বেদখল করা হয়েছে। অপরদিকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ১৯৯০ থেকে ৩১ মে ১৯৯৮ এর মধ্যে বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রিজার্ভ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের কাজের নামে ২,১৮,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষত ১৯৭৮-৭৯ হতে ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে ৪-৫ লাখ বহিরাগত বাঙালি অবৈধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিপ্রদানের ফলে জুম্মদের রেকর্ডীয়, ভোগদখলীয় ও মৌজাধীন শত শত একর ভূমি বেদখল করা হয়। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ২৫টি উপজেলার মাত্র ২/১টি উপজেলা বাদে অন্য সকল উপজেলায় গ্রামের পর গ্রাম জুম্মদের ভূমি বেদখল করা হয় এবং এই বেদখলের পরিধি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

সাম্প্রতিককালে সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক ক্যাম্প স্থাপন বা ক্যাম্প সম্প্রসারণ, বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, বহিরাগত কর্তৃক বেসরকারি উদ্যোগে উন্নয়নের নামে বা ছলে-বলে-কৌশলে ক্রয় করার মধ্য দিয়ে জুম্মদের শত শত একর ভূমি দখল, বেদখল, অধিগ্রহণ করে স্বভূমি থেকে জুম্মরা উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। বাইরে উন্নয়ন, নিরাপত্তার কথা বলে নীরবে, নিভৃতে এই ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে।

সরকারি উদ্যোগে বা প্ররোচনায় পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বা বসতিস্থাপন শুরু হয় পাকিস্তান আমলেই। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে হাজার হাজার বাঙালিকে বসতিদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে ১৯৪৭ সালে যেখানে বাঙালি জনসংখ্যার হার ছিল মাত্র ২.৫% ভাগ, সেখানে ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় ৭.০% ভাগ ও ১৯৬১ সালে হয় ১২.০% ভাগ। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই, বিশেষ করে সামরিক শাসনামলে সরকারি উদ্যোগে এই অনুপ্রবেশ, জুম্মদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বসতি প্রদান বিশ্বে নজীরবিহীন এক আগ্রাসী

> “পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ভিন্ন সংস্কৃতির জাতিসমূহ দেশীয় প্রেক্ষাপটে নিজেদের সম্মিলিতভাবে জুম্ম বা স্বতন্ত্রভাবে পাংখোয়া, খুমী, লুসাই, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, অহমিয়া ও গুর্খা পরিচয় দিতে চায় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঐ পরিচয়ের পাশাপাশি তারা 'ইন্ডিজেনাস বা আদিবাসী' হিসেবেও পরিচয় লাভের অধিকারী। নিজের পরিচয় নিজে নির্ধারণের মৌলিক মানবাধিকারকে পদদলিত করে সরকার একতরফাভাবে এদের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ইত্যাদি পরিচয় চাপিয়ে দিতে চায়। এর মধ্য দিয়ে সরকার-শাসকগোষ্ঠী মূলত জুম্মদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বে পরিণত করে। সরকার জুম্মদের 'উপজাতি' হিসেবে পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে অধঃস্তন জাতি বা আদিম-অসভ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিহ্নিত করার পক্ষপাতি।

পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। কেবল ১৯৭৮ হতে ১৯৮৪ সালের মধ্যে জিয়াউর রহমান সরকার ও এরশাদ সরকারের আমলে অন্তত ৫ লক্ষ সেটেলার বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় বসতি প্রদান করা হয়। বলাবাহুল্য, সেটেলারদের বসতি দেয়া হয় স্থানীয় জুম্মদের উচ্ছেদ করে তাদের কেড়ে নেয়া ভূমি উপরেই। এর ফলে জুম্ম জনগণ দ্রুত নিজভূমিতে পরবাসীতে পরিণত হয়, অনেক এলাকায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ জেলা-উপজেলা সদরে, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক কেন্দ্রে হয় কোণঠাসা নতুবা প্রান্তিক অবস্থা বরণ করতে বাধ্য হয়। যেখানে সেটেলারের বসতিস্থাপন রয়েছে সেখানেই সবচেয়ে বেশি ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা, ধর্ষণ ইত্যাদি সংঘটিত হয়। বলাবাহুল্য, ১৯৮৪ সালের পরও বিভিন্ন কায়দায় কখনো অগোচরে, কখনো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়া থেমে নেই।

আদিবাসী জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের সবচেয়ে নিষ্ঠুর কার্যক্রম হচ্ছে গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলা। আর এই গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলার পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী ও বসতিস্থাপনকারী সেটেলাররা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্তত ১৫টি বড় ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে বা মদদে সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা জুম্মদের উপর অন্তত ২০টি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করার গভীর প্রতারণামূলক একটি কার্যক্রম হল উন্নয়ন কার্যক্রম। পাকিস্তান আমলে যেমনি এধরনের এই কার্যক্রম চলেছে, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর তা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এই উন্নয়ন আগ্রাসনের বিশেষ দিক হল– সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসী ও নেতৃবৃন্দের মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা না করা। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য কী সুফল বা কুফল বয়ে আনতে পারে সেব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে তথ্যানুসন্ধান বা তথ্যবিনিময় না করা। সাম্প্রতিককালে এর উদাহরণ হল– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বরকলের ঠেগামুখে স্থল বন্দর স্থাপন ও চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আদিবাসী জুম্মদের ও প্রতিনিধিদের মতামত বিবেচনায় না আনা। এছাড়া সেনাবাহিনী ও বিজিবিও উন্নয়নের কথা বলে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করে, যাতে অনেক আদিবাসী জুম্মর ভূমি হারানো বা বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার অভিযোগ ও ঘটনা রয়েছে।

সরকার-শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অন্যতম অপকৌশল হল 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির প্রয়োগ। এর জন্য সরকার ও ষড়যন্ত্রকারীরা জুম্মদের মধ্য থেকে কিছু দালাল-প্রতিক্রিয়াশীল-সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি ও লালনপালন করে থাকে। সেই গোষ্ঠী কায়েমী সুবিধাবাদী ও দালালী চরিত্রের কারণে নিজ জাতি বা এলাকার মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেও হীন অবস্থান নিতে দ্বিধাবোধ করে না। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত করতে বা জনগণের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এমন হীন কৌশল নেই যা তারা অবলম্বন করতে পারে না। এরা নিজেরা অনুসরণ বা আচরণ না করেও সাধারণ জনগণের ধর্মীয় অনুভুতিকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রতারণামূলক বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত বাস্তবতা ও পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালায়।

বর্তমান সরকার সবসময়ই নিজেকে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু বান্ধব ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার হিসেবে দাবি করে থাকে। দাবি করার অবশ্যই কিছু পটভূমি রয়েছে। কারণ এই দলটি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, স্বৈরাচারী সামরিক শাসন উৎখাতের আন্দোলনেও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে, সংখ্যালঘুরা এপর্যন্ত এই দলটিকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন ও ভোট দিয়েছে, জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ সফল করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কার অর্জন করেন। কিন্তু তার বিপরীতে যদি বাস্তব অবস্থাটা দেখি, তাহলে দেখতে পাই, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের প্রতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি এ সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতা চরম হতাশাজনক, উদ্বেগজনক ও প্রতারণামূলক।

বলাবাহুল্য, ঐতিহাসিকভাবে বহু জাতি বহু সংস্কৃতির এই দেশে এবং স্মরণাতীত কাল থেকে জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ ও বৃহত্তর জাতির জাতীয়তাবাদ চাপানোর চেষ্টা কোনভাবে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত হতে পারে না। ঔপনিবেশিকতার পরিণতি কখনো ভালো হতে পারে না। এটি নিপীড়ন ও আগ্রাসন-আধিপত্যের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য যেমনি চরম দুর্ভোগের ও দুর্দশার, তেমনি দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ও সংহতির জন্যও হুমকি স্বরূপ। জাতি বা জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক অন্যায়ভাবে তাকে দমন-পীড়ন, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ কোনভাবে দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, গণতন্ত্র, সুশাসন ও কল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। কাউকে যেভাবেই হোক নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিলে সে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা ও যুব সমাজের করণীয়

।। বিনয় কুমার ত্রিপুরা ।।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ও ইন্দিরা গান্ধি শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও তাঁর দল শেখ হাসিনার এই অর্জনকে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা ফলাওভাবে প্রচার করে থাকে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তারা কোন আগ্রহই প্রদর্শন করেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ আজ একনাগারে ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমানে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ফেলে রেখে দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা উঠলেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে। যেমন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে দেয়া তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি'র চিত্র তুলে ধরেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বস্তুত যে কোন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সেই জনগোষ্ঠীর স্বশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি এসব পরিষদসমূহকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে।

উন্নয়ন তখনই গণমুখী, পরিবেশ-বান্ধব ও সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠে যখন সেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো যেমন- আইনের শাসন, গণমানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও সুশাসন বলবৎ থাকে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই মৌলিক মানবাধিকার ও সুশাসন নেই বললেই চলে। সুতরাং সেখানে যতই উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হোক না কেন, সেই উন্নয়ন কখনোই জনমানুষের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার দিকে তাকালে সহজে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

> “১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে দেয়া তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি'র চিত্র তুলে ধরেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

শাসকগোষ্ঠী উন্নয়নের নামে জুম্ম জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে হীনউদ্দেশ্যে তথাকথিত উন্নয়ন চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, জুম্মদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করে সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন, বনায়নের নামে জুম্মদের উচ্ছেদ, পর্যটনের নামে জুম্মদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, শিক্ষার দোহাই দিয়ে জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদ। যে উন্নয়ন জুম্ম জনগণকে উদ্বাস্তু করে, সংস্কৃতিকে ধ্বংস ও জাতিগত অস্তিত্বকে বিপন্ন করে, সেই

উন্নয়ন কখনোই জনমুখী ও টেকসই হতে পারে না। অথচ এসব তথাকথিত উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তথা জাতিগত নিপীড়নমূলক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ যখন প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন শাসকশ্রেণি প্রতিবাদী জুম্ম জনগণকে উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদ এখন ক্ষমতাসীন দলের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের টাকা কামানোর যন্ত্রে রূপান্তর করা হয়েছে। জনগণের প্রতি নেই তাদের কোন দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা। এই পরিষদগুলো সীমাহীন দুর্নীতি, লুণ্ঠন, ঘুষের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগে চলছে প্রকাশ্যে চাকরি বেচা-কেনা। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধ্বংসের পথে। যেমন- গত আগস্টে (২০১৭ সালে) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩৫৮টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের বিপরীতে ৭ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষের কথা, এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া শাসকগোষ্ঠীর সবচেয়ে দুর্নীতির চিত্র পাওয়া যায় বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের ড্রপ ওয়ালের নির্মাণ কাজে রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহারের ঘটনা। গত ১৯ জুলাই ২০১৭ বাংলা ট্রিবিউন অনলাইনে একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়।

পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে শাখা অফিস স্থাপন, কমিশনের কার্যবিধিমালা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি ফেলে রেখে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি অচলাবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রায় দুই বছরের অধিক সময় ধরে এই কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। অনুরূপভাবে নামসর্বস্বভাবে রাখা হয়েছে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সকে। ফলে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুরা অনিশ্চিত ও মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত পার্বত্য জেলা পরিষদ পার্বত্য চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শুধু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নয়, পার্বত্য চুক্তির অন্যতম ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলারা আরো এক ধাপ এগিয়ে রাজা যা বলে তারা বলে আরো বহুগুণ। চুক্তির ৭২টি ধারার ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে পার্বত্য মন্ত্রণালয় মিথ্যার বেসাতি ফেরী করে।

উন্নয়ন জোয়ারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভেসে যাচ্ছে বলে তারা আস্ফালন করেন। দালালীপনায় তারা এমন উন্মাদে পরিণতে হয়েছেন তারা আজ তাদের জন্মদাতা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকেও পদদলিত করছেন, জুম্ম জনগণের সংগ্রামী ইতিহাসকেও ভুলে গেছেন। পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মন্ত্রী-আমলা-চেয়ারম্যান-সদস্যরা ভুলে গেছেন যে, আজকে তারা যে চেয়ারে বসে রয়েছেন, সেটা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আন্দোলনের ফলে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফসল। জুম্ম জনগণের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, শত শত শহীদদের আত্মত্যাগ, বহু মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু তারা আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কোন নামগন্ধও নেই। বরঞ্চ 'অপারেশন উত্তরণ' নামে জারীকৃত সেনাশাসনের বদৌলতে বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনীর শাসনে অস্ত্র ও বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে চলেছে জুম্ম জাতির মৌলিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা। সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে নির্বিচারে নিরপরাধ লোকদের ধর-পাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ, জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলছে। রাষ্ট্রের নিপীড়নমুলক সামরিক শক্তির মহড়া ও ভূমি দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি সন্ত্রাসী এলাকা হিসেবে অপপ্রচার করা হয়। আর এই অপপ্রচারকে প্রমাণিত করার জন্য নানা নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। অতীতে এধরনের বহু ঘটনা পার্বত্যবাসী দেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালি কর্তৃক যতগুলো সাম্প্রদায়িক হামলা, গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষভাবে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি লংগদুতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলায়, অগ্নিসংযোগের সময় ইন্ধনদাতা হিসেবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। সেটেলার বাঙালিদের সমাবেশে লংগদু জোন কমাণ্ডার বক্তব্য রেখেছেন। জুম্মদের বাড়িঘরে সেটেলার বাঙালিরা যখন আগুন দিচ্ছে, জুম্মদের বাড়িঘর যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সেখানে সেনাবাহিনী কেবল উপস্থিত ছিল না, তারা অগ্নিসংযোগরত সেটেলার বাঙালিদের প্রতিরোধকারী জুম্ম গ্রামবাসীদের ধাওয়া করেছিল। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন এসে যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কার নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত?

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দমন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। জুম্মদের মধ্যে বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংগঠনও কিছু সেনা কর্মকর্তা গঠন করে দিয়েছিল। সে ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। বান্দরবানের লামায় অর্থের লোভ দেখিয়ে ত্রিপুরাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করাসহ নানা ভুঁইফোড় সংগঠন সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। আজও পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়নমুখী সামরিক শক্তির মহড়া জুম্ম জনগণকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত করে রাখে। শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণ ও সামরিক শক্তি বিস্তারে বরাবরই নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে থাকে।

জুম্ম জাতির অধিকারের ঐতিহাসিক সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম ২০ বছর ধরে চলমান আছে। গণতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থা কার্যকর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জাতির সামগ্রিক জীবনধারার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। শাসকগোষ্ঠী বিমাতাসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য অব্যাহতভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে। স্বাধীনতার ৪৬ বছরেও শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায় বিচারের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বোধ দেখাতে পারেনি। জুম্ম জনগণের সমস্যাকে মানবিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসহ দেশের সকল জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করাসহ আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও অপমানজনক নানা নামে পরিচিতিকরণ করা হয়েছে, যা বিভ্রান্তিমূলক। সঙ্গতঃ কারণেই অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও জাতি-আগ্রাসী পঞ্চদশ সংশোধনীকে আদিবাসীরা প্রত্যাখ্যান করে যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা কর্ণপাত করেনি!

জুম্ম জনগোষ্ঠী আজ দুঃখ-কষ্টে এক দুর্বিষহ, বিভীষিকাময় জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যখন অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে তখন দেশের সাম্প্রদায়িক, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী, স্বার্থান্বেষী মহল এটাকে ভুল ব্যাখা দিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। তারা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ইত্যাদি আখ্যায়িত করে অপপ্রচার চালায়। অত্যাচারী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এদেশের মুক্তিকামী, অধিকারকামী জনতার সাথে যে আচরণ করেছিল, ভাবতে অবাক লাগে আজকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও জুম্ম জনগণের সাথে ঠিক একই আচরণ করছে! যে দেশ পাকিস্তানীদের হাতে বর্বর নির্যাতন, নিপীড়ন, বৈষম্যের শিকার থেকে মুক্তি লাভ করেছে, সে দেশের শাসকগোষ্ঠী আবার জুম্ম জাতিসহ দেশের প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে! পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের উপর এক নয়া-ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। জাতি আগ্রাসী, উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করছে। তাই প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণকে নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে যতই কালক্ষেপণ করবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ততই জটিল ও অশান্ত হয়ে উঠবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র সুসংহত করা ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রত্যাশা হবে সুদূর পরাহত। এক সময়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ডিপ ফ্রিজে ছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করেছি। এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সকল ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করবো। আর কোন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন বাদ যাবে না। এরপর আওয়ামী লীগ নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে শতকরা হিসাব কষতে শুরু করলো। কিন্তু সরকার এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের কোন কথাই উচ্চারণ করছে না! পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। ২০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি, এখন সম্পূর্ণভাবে প্রতারণায় পরিণত হয়েছে।

সরকার যদি চিন্তা করে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য বেপরোয়াভাবে দমন-পীড়ন আরো জোরদার করবে। কিংবা সরকার যদি ভেবে থাকে যে, জুম্ম জনগণ আর আন্দোলন করতে পারবে না। তাহলে সরকার সেটা চরম ভুল করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন ছাইচাপা আগুনের মতো। যা দেশের জন্য সুখকর কোন পরিস্থিতির জন্ম দেবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার অশান্ত হয়ে উঠুক, আবার রক্ত ঝড়ুক- এটা নিশ্চয়ই কোন প্রগতিশীল, গণতন্ত্রমনা, মানবতাবাদী, শান্তিকামী মানুষের কামনা হতে পারে না।

তাই আজ প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা শাসকগোষ্ঠীর এই আগ্রাসন কি চোখ বুজে মেনে নেবো? এই জাতিগত আগ্রাসনে আমরা কি নিরীহ দর্শকের মতো কেবল প্রত্যক্ষ করে থাকবো? নাকি চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিগত আগ্রাসন প্রতিরোধে আমরা আত্মবলিদানে ভীত না হয়ে অধিকতর দুর্বার সংগ্রাম সংগঠিত করবো? বস্তুত জুম্ম জাতি হিসেবে আমরা ধ্বংস হতে পারি না, কোন ধ্বংসকে মেনে নিতে পারি না, শাসকগোষ্ঠীর অবিচার চোখ বুজে সহ্য করতে পারি না। আমরা যদি নিজেদের ধ্বংস মেনে নিতে না চাই, আমরা যদি মাথা উঁচু করে এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমরা বসে থাকতে পারি না। আমাদেরকে যে কোন কঠিন আন্দোলনে, যে কোন অধিকতর আন্দোলনে সামিল হতেই হবে তার কোন বিকল্প নেই।

যুগে যুগে সচেতন ছাত্র ও যুব সমাজই শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নমূলক যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকেও জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে গৌরবময় ইতিহাস। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘ দু'দশকের অধিক সময় সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসেও ছাত্র-যুব সমাজের দীপ্ত পদচারণা ছিল। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জুম্ম জনগণের উপর শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চলছে। এমতাবস্থায় ছাত্র ও যুব সমাজ কি আবার কীর্তিময় সংগ্রামী গৌরবগাথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে পারবে না? ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে জুম্ম জাতির প্রত্যাশা অনেক। একারণেই আজকে ছাত্র ও যুব সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বাস্তবতাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপথ শেষাবধি যে দিকেই ধাবিত হোক না কেন, ছাত্র ও যুব সমাজকে আবারও মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

শাসকগোষ্ঠীর উন্নয়নের রোষানলে জুম্ম জনগণের অবস্থা

॥ জুয়েল চাকমা ॥

বাল্মিকী রচিত মহাকাব্য রামায়ণে দুটি চরিত্র (যদিও প্রধান চরিত্র নয়) নল এবং নীল ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা দুজন এতই দুষ্ট ছিল যে সারা গ্রাম অতিষ্ট হয়েছিল তাদের যন্ত্রণায়, বিশেষ করে মুনি ঋষিদের জন্য। তারা মুনি ঋষিদের যজ্ঞ করার জিনিসপত্র যেমন পানির লোটা, তেলের বাতি ইত্যাদি যজ্ঞ করার সময় ঋষিদের অগোচরে চুরি করে পানিতে ফেলে দিত। তাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যায়ে এক মুনিঋষি বাধ্য হন তাদের অভিশাপ দিতে। ঋষির অভিশাপটি ছিল এই রকম যে: তারা কোন জিনিস যদি নদীতে ফেলে দেয় তাহলে সেই জিনিস পানিতে ভাসতে থাকবে কোনোদিন ডুববে না। এই অভিশাপ পরবর্তীতে আশীর্বাদ হয়ে রামের জয়কে একধাপ এগিয়ে দেয়। এই অভিশাপের ফলে রাম অথৈ সমুদ্রের বুকের উপর রাবণরাজ্য লঙ্কায় পৌঁছানোর জন্য পাথরের সেতু নির্মাণ করে। যার ফলে রাম তাঁর বিশাল বানর সৈন্যবাহিনী নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছতে সক্ষম হন।

> “ জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য ও সর্বোপরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙালি বসতি প্রদান, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, নিরাপত্তার নামে ভূমি দখল করে ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি অব্যাহত রেখেছে শাসকগোষ্ঠী।

আমি আর রামায়ণের মহাকাব্যে যাচ্ছি না। আমার লেখার মূলবস্তু রামায়ণ মহাকাব্য লেখা নয়, আমার লেখার বিষয় হল অভিশাপ এবং আশীর্বাদ নিয়ে। সেই সত্যযুগের দেবতা এবং মুনিঋষিরা আজ নেই কিন্তু বর্তমানে কলিযুগে সেই দেবতা ও মুনিঋষিরা এসেছে নতুন ভার্সনে যেখানে দেবতার আসনে সরকার এবং ঋষিদের আসনে রাষ্ট্রযন্ত্র। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় বাহিনী খ্যাত মুনিঋষিরা দেবতা হয়ে কার্যনির্বাহ করছে। দেশবিভাগের পর পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য কাপ্তাই বাঁধ আশীর্বাদ করেছিল। জুম্ম জনগণ যে কত কষ্টে আছে সেটি উপলব্ধি করে অন্ধকারময় জীবন আলোকিত করার দোহাই দিয়ে, বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার নামে কর্ণফুলীর বুকের উপর বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরিণামে পাহাড়িদের ৫৪ হাজার একর ধান্যজমি পানির নিচে তলিয়ে যায় যেটি তাদের একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তি, এক লক্ষ পাহাড়ি-বাঙালি মানুষ তাদের জমি হারায়, দেশ থেকে ৪০,০০০ জন জুম্ম ভারতে এবং ২০,০০০ জন জুম্ম মায়ানমারে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতার পালাবদল হয়। পূর্ব পকিস্তানের স্থলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র নামে মানচিত্রে জায়গা হয়। সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ক্ষমতার পালাবদলে সেনাশাসক জিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তারও যেন মায়াকান্না বেড়ে যায় এই নিরীহ পাহাড়িদের জন্য। তাই তিনি ১৯৭৬ সালে পাহাড়িদের তথাকথিত যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য, বনায়নের জন্য, এবং জুম্মদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য জুম্ম জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি আশীর্বাদ দেন যেটির কাজ জিয়াউর রহমান শুরু করলেও পরবর্তীতে স্বৈরশাসক এরশাদ থেকে প্রতিটি সরকারের আমলেও সেটির কাজ নির্দ্বিধায় চালিয়ে যায়। উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমরা দেখতে পাই প্রতিষ্ঠানটি মূলত বহিরাগত সেটেলারদের পুনর্বাসন পাকাপোক্ত করা এবং তারা যাতে এখানে খাপখাওয়াতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া, প্রধানত সামরিক বাহিনী ও সেটেলারদের চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তা ও সড়ক নির্মাণ করা, যাতে সহজে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করা যায়, জুম্ম দালালদের তুষ্ট করা ইত্যাদি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এবারও দেবতার আর্শীবাদ নিরীহ জুম্মদের হজম হলো না।

প্রতিটি জিনিসের পজিটিভ ও নেগেটিভ দুটি দিক থাকে। যেহেতু হজম হলো না সেহেতু বদহজমের মাশুল দিতে হলো। ফলে জুম্মদের জোরপূর্বক নিজের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করতে বাধ্য করা হলো। জুম্মদের স্বনির্ভর অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিয়ে রাবার প্লান্টেশন ও বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট নির্ভরশীল হয়ে দিনমজুরির বিনিময়ে জুম্ম জনগণ কাজ করতে বাধ্য হলো। বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করার জন্য প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চুক্তির পূর্বে সেটেলার বাঙালিরা ১৫টির অধিক গণহত্যা সংঘটিত করে, যেখানে শত শত জুম্মদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, জুম্মদের শত শত ঘরবাড়িসহ গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়, অসংখ্য জুম্ম নারীকে ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়, হাজার হাজার জুম্ম প্রতিবেশী ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারি, যে জায়গাগুলোতে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে সে এলাকায় আগে যেখানে ৯৮ ভাগ জুম্ম বাস করত সেখানে এখন পাহাড়িদের সংখ্যা মাত্র ২০-৩০ ভাগ বাকিরা বহিরাগত সেটেলার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ পর্যন্ত যতগুলো মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে এখনো পর্যন্ত সেগুলোর একটাও বিচার হয়নি। হবেই বা কেন? এটা তো দেবতার আশীর্বাদ। দেবতা

যদি নিজের বিচার করে তাহলে তো বলার নেই। উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নও থেমে নেই বরঞ্চ তার গতি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জুম্ম জনগণের ভাগ্যের চাকাও দিন দিন দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। সড়ক হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে আর বনও উজার হচ্ছে সমান তালে। তাই পরিসংখ্যানে দেখতে পাওয়া যায় ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত গাছ কাটার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট ২০০১-এ বলা হয়েছে, 'এখানে আমাদের এলাকায় অনেক গাছ আছে। বাঙালিরা গাছ ও বাঁশ কাটে। সেনাবাহিনী এবং বাঙালিরা একসাথে গাছ কাটছে এবং তারাই যৌথভাবে কাঠ ব্যবসা ও পাচার করছে।' যে উন্নয়ন বোর্ড বনাঞ্চল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সেই উন্নয়ন বোর্ড মূলত বন উজারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে অর্থাৎ যে রক্ষক সে ভক্ষক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর জাতিগত নিধন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী সম্প্রসারণবাদের যে প্রক্রিয়া তা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে দেশান্তরী এবং অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর করেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য ও সর্বোপরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙালি বসতি প্রদান, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, নিরাপত্তার নামে ভূমি দখল করে ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি অব্যাহত রেখেছে শাসকগোষ্ঠী। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসকগোষ্ঠী কৌশল পরিবর্তন করেছে বারংবার কিন্তু জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার যে মনোভাব সে নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে এক বিন্দু পিছপা হয়নি। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষর করেছিল সেটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জুম্ম নিধনের একের পর এক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে।

পার্বত্য চুক্তি-উত্তর সময়েও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০টি সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর সময়ে অন্তত ১৯টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৭ অক্টোবর ২০১৫ রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ছাত্রলীগ কর্মীরা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রমূলক ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এই হামলায় অন্তত চারজন জুম্ম আহত গুরুতর আহত হন। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট ইউনিয়নের বগাছড়ি এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে ও সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিরা ৩টি জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে ৫০টি বাড়ি ও চৌদ্দমাইলের ৭টি দোকান সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেয়, ৫টি দোকান লুটপাট ও ভাঙচুর করে এবং এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারধরসহ বিহারের বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করে। এই হামলার সময় স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধিসহ ৩ জুম্ম গ্রামবাসী সেনাবাহিনীর সদস্যদের মারধরের শিকার হয়েছে।

উন্নয়ন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে জুম্মদের উচ্ছেদ করা এবং নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে রাবার প্লান্টেশনসহ হর্টিকালচারের দোহাই দিয়ে বহিরাগতদের নিকট পার্বত্যাঞ্চলের শত শত একর ভূমি দীর্ঘমেয়াদী লীজ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে দীর্ঘমেয়াদি ভূমি লীজ দেওয়া হয়েছে সেসব লীজ বাতিল করার বিধান থাকলেও তা না করে চুক্তি-উত্তর সময়েও সরকার বহিরাগতদের নিকট লীজ দেয়া অব্যাহত রেখেছে। এই পর্যন্ত বহিরাগতদের নিকট বান্দরবান সদর উপজেলায় রাবার প্লান্টেশন নামে ৯১টি প্লটে ২,২৭৫ একর জমি এবং হর্টিকালচার নামে ১১৯টি প্লটে ২৮৫৫ একর জমি, লামা উপজেলায় রাবার প্লান্টেশন নামে ৮৩৫টি প্লটে ২০,৮৭৫ একর জমি এবং হর্টিকালচার নামে ১৭৭টি প্লটে ৪৫০০ একর জমি, আলিকদম উপজেলায় রাবার প্লাটেশন নামে ১৯৪টি প্লটে ৪৮৪৭ একর জমি এবং হর্টিকালচার নামে ৬২টি প্লটে ১,৫৫০ একর জমি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় রাবার প্লান্টেশন নামে ১১২টি প্লটে ২৮০০ একর জমি এবং হর্টিকালচার নামে ১৫টি প্লটে ৩৭৫ একর জমি লীজ দেয়া হয়েছে যা হিসাব করলে দেখতে পাই এই পর্যন্ত আদিবাসীদের নিকট থেকে সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট এর বিপরীতে প্লট প্রতি ২৫ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয় স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি।

এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম আদিবাসী তাদের জুমক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সামরিক ও সিভিল প্রশাসনের মদদে ও সহায়তায় বহিরাগত ব্যবসায়ী/ প্রভাবশালী ব্যক্তি/ ভূমিগ্রাসীদের উদ্যোগে ভূমি জবরদখল চলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, নাইক্ষ্যংছড়িতে ২১টি চাক পরিবারকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত প্রভাবশালী কর্তৃক তাদের জায়গা-জমি জবরদখল। লামা উপজেলার লুলেইন মৌজার ২৫০টি ম্রো পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; লামায় জনৈক লাদেন গ্রুপ কর্তৃক ফাস্যাখালি ইউনিয়নের ৭৫টি ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ও স্থায়ী বাঙালি পরিবার উচ্ছেদ করে ১৭৫ একর জায়গা জবরদখল এবং আরো ২২১টি পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; মুজিবুল হক গং কর্তৃক মারমা গ্রামবাসীর উপর হামলা চালিয়ে লামা উপজেলায় রূপসী ইউনিয়নে প্রায় ৫০০ একর জায়গা দখলের অপচেষ্টা; রোয়াংছড়ি উপজেলায় বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক ৩৩টি মারমা পরিবারের রেকর্ডীয় জমি জালিয়াতির মাধ্যমে বন্দোবস্তকরণ ও জবরদখলের অপচেষ্টা; আলিকদম উপজেলায় বদিউল আলম নামে জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক ম্রো, ত্রিপুরা ও মারমা পরিবারের প্রায় ১,০০০ একর রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি জবরদখল ইত্যাদি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৫০০টির অধিক যে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প রয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকারের পক্ষ

থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজারা হাজার একর জমি অধিগ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে সুয়ালকে গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে ১১,৪৪৫.৪৫ একর জমি ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১৯,০০০ একর জমি, রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ৯৫৬০ একর জমি, বান্দরবান ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণ চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন ১৮১ একর জমি, টংকাবতিতে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনী পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫৫০০ একর জমি, বান্দরবান-লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন ২৬,০০০ একর জমি, রুমা উপজেলাধীন পলি মৌজার বিজিপি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার জন্য ২৫ একর জমি, দীঘিনালা বিজিপি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার জন্য ৪৫ একর জমি, বান্দরবান সদরে হ্লাপাইক্ষ্যং মৌজায় বিজিপি ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়ার্টার জন্য ১৩ একর জমি, মাটিরাঙ্গা ওয়াসু মৌজায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য ৮ একর এবং মাটিরাঙ্গায় পলাশপুর বিজিবি ক্যাম্প সম্প্রসাণের জন্য ১০০ একর জমিসহ সর্বমোট ৭১,৮৭৭.৪৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ও অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রক্রিয়া কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে রুমা উপজেলায় পলি মৌজাধীন থানা পাড়ায় বিজিবি ব্যাটেলিয়ান স্থাপিত হলে থানা পাড়ায় ৪০ পরিবার, বড়শি পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং উপরে ও নীচের রুমাচর পাড়ায় ৫০ পরিবার মারমা আদিবাসী উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। এছাড়াও দীঘিনালা বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের কারণে ২১টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেদখল হয়েছে এবং রুমা উপজেলায় পাইন্তু মৌজা ও পলি মৌজায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও বান্দরবান সদর উপজেলার হ্লাপাইক্ষ্যং মৌজায় বিজিবি ব্যাটেলিয়ন সদর সদর দপ্তর স্থাপনের কারণে ৫০০ মারমা পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে এবং রুমা সেনানিবাসের সম্প্রসারণের জন্য ম্রো আদিবাসীসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে।

এছাড়াও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার নামে জুম্মদের তাদের প্রথাগত আইনের আওতায় মালিকানাধীন জুমভূমি ও ভোগদখলীয় ভূমি এবং বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াধীন ভূমি থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তার চলছে। যার ফলে আমরা দেখতে পাই সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ১৯৯০ থেকে ৩১ মে ১৯৯৮ তারিখ জারিকৃত বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২,১৮,০০০(দুই লক্ষ আটারো হাজার) একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় ২০টি মৌজার ৮৪৫৪২.৪২ একর মৌজা ভূমি এবং বান্দরবান জেলায় ৭২,০০০ একর ভূমি রয়েছে । এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রায় দুই লক্ষ পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসী তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে এবং এটির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে এবং বংশ পরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনা এবং পুলিশের প্রহরায় রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অথচ এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমগ্র জুম্ম জনগণ আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সরকার সেটি না করে জোরপূর্বক স্থাপন করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা সরকারের হীন ষড়যন্ত্র ফুটে উঠে। অথচ যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ

> “পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনা এবং পুলিশের প্রহরায় রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অথচ এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমগ্র জুম্ম জনগণ আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সরকার সেটি না করে জোরপূর্বক স্থাপন করে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা সরকারের হীন ষড়যন্ত্র ফুটে উঠে। অথচ যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসহ কলেজ শিক্ষা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত নাজুক। তিন পার্বত্য জেলার বেসরকারি কলেজসহ পার্বত্য অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক গ্রামে এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারি কলেজে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক, নেই প্রয়োজনীয় ক্লাস রুম, নেই ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা, সর্বোপরি নেই কোন উন্নত শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ।

মাধ্যমিক শিক্ষাসহ কলেজ শিক্ষা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত নাজুক। তিন পার্বত্য জেলার বেসরকারি কলেজসহ পার্বত্য অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক গ্রামে এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারি কলেজে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক, নেই প্রয়োজনীয় ক্লাস রুম, নেই ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা, সর্বোপরি নেই কোন উন্নত শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ। তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারি কলেজে মাত্র কতিপয় বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ থাকলেও শিক্ষক সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাছাড়া যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্ধেক শিশু প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্টের অভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারে না সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে কিভাবে? যাদের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা যদি সেটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্তর অতিক্রম করতে না পারে এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে অসমর্থ হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় নাকি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কোনটি আগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা সহজেই বুঝা যায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না করে সরকারের এই উচ্চ শিক্ষা আয়োজন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও অযৌক্তিক।

অন্যদিকে উন্নয়নের নামে, পাহাড়িদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে পর্যটন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাহাড়িদের তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে, সর্বোপরি পাহাড়িদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারা, ভূমি অধিকার এবং পরিবেশ ও জীবন-বৈচিত্র্য বিবেচনায় না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে নির্বিচারে ব্যাপক হারে পর্যটন স্থাপন, পর্যটনের নামে ইচ্ছেমাফিক ব্যাপক এলাকা জবরদখল করে চলেছে। তাছাড়া ১০ আগস্ট ২০১৪ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৫টি পর্যটন স্পট (জীবন নগর, ডিম পাহাড়, নীলগিরি, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত, নীলাচল, পর্যটন কমপ্লেক্স, জীবতলি লেইক সাইড রিসোর্ট, আরণ্যক লেকসাইড রিসোর্ট, সুভলং, রিসোর্ট ইসিবি সাজেক, আলুটিলা, বাঘাইহাট, গিরিশোভা) হস্তান্তর ও পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান করার স্বার্থে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যার দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের জাতিগত নির্মূলীকরণ হাতিয়ার হিসেবে এই পর্যটন খাতকে বেছে নিয়েছে। আর পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির যে সরকার কর্তৃক প্রচারণা তা মূলত জনগণকে বিভ্রান্ত করে অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র জোরদার করার অপচেষ্টা।

অপরদিকে পর্যটন শিল্পকে নিয়ে যে উদ্যোগ সেটি বাস্তবায়িত হলে অনেক আদিবাসী গ্রাম ও পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হবে যেমন- কাপ্রু ম্রো পাড়ায় রেকর্ডভুক্ত ১৬ একর ও ভোগদখলীয় ৬০ একর মোট ৭৬ একর ভূমি দখল করে নীলগিরি স্থাপনের ফলে ৬টি গ্রামে ২০০ ম্রো ও মারমা জনগোষ্ঠীর পরিবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সেপ্রু পাড়ায় জীবননগর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৬০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চলছে ফলে ৩টি গ্রামে ১২৯ ম্রো পরিবার, সাজেকে ৫ একর ভূমির উপর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে ২টি গ্রামের মোট ৬৫টি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পরিবার, বান্দরবানে ডিমপাহাড় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চলছে ফলে ১২টি গ্রামে ২০২ ম্রো পরিবার এবং নীলাচল পর্যটন স্পট স্থাপনের ফলে ৩টি গ্রামের ১০০টি ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা জনগোষ্ঠীর পরিবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হচ্ছে। মূলত পর্যটন কেন্দ্রের জন্য যে ভূমিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমি যেখানে আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় প্রথাগতভাবে জুম চাষ ও বাগান বাগিচা সৃষ্টি করে আসছে। সে বন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জুম্ম জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং এসব এলকায় জুম চাষ, বাগান-বাগিচা গড়ে তোলা, মৌসুমী ক্ষেত-খামারের কাজে জুম্মদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। এর ফলে জুম্মদের জীবন-জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, তাদের বাস্তুভিটা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবন-বৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এছাড়াও পাহাড় কেটে পর্যটকদের জন্য আবাসন ও বিনোদন স্পট তৈরি করার ফলে বন উজার হচ্ছে এবং জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, ভূমি ধস বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। ফলে আদিবাসী জুম্মদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ছে।

উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো ভূমি। পায়ের তলায় মাটি না থাকলে কারো পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয় মেরুদণ্ড যতই সোজা হোক না কেন। সেই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্যে শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে উন্নয়নের নামে, পর্যটন শিল্প বিকাশের নামে সেই ভূমি কেড়ে নেয়ার এবং উচ্চশিক্ষা নামে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বাঙালি পুনর্বাসন করার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। সরকার বলেছিল তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে চায় এবং পাহাড়ি জনগণও শান্তির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সাড়ে ৩ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর বর্তমান মহাজোট সরকার একটানা ৯ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে অনেকাংশে দূরে সরে গেছে। ফলত যে সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে সমস্যাগুলো পূর্বের তুলনায় আরো জটিল আকার ধারণ করেছে এবং করছে। সরকার প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে চলেছে। তথাকথিত উন্নয়ন জোয়ারের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমি বিপন্ন করে তুলছে। সরকারকে বুঝতে হবে ইট ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়। ইতিহাস শিক্ষা দেয় বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কখনোই সুখকর নয়।

'ভাগ কর শাসন কর' নীতি ও জুম্ম জাতীয়তাবাদ

৷৷ পলাশ চাকমা জুম্মো ৷৷

১.

'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' বা 'ভাগ কর শাসন কর' নামের একটা রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। সচরাচর যারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন আমরা তাদের মাধ্যমে জেনেছি যে, বৃটিশরা এই 'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতবর্ষে তাদের শাসন ২০০ বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছিল। এর মাধ্যমে তারা উপমহাদেশে জাতিতে জাতিতে বিভেদ ও সংঘাত উস্কে দিয়ে, কখনো সুবিধাবাদী তাবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করে, কখনো হিন্দু আবার কখনো মুসলমানদের সমর্থন করে তাদের ঐক্যের ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছিল এবং এভাবেই তারা নির্বিঘ্নে শাসন ও শোষণের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। দুই'শ বছর ধরে গোলামীর পর উপমহাদেশের মানুষ যখন বুঝতে পারলো তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, যখন তারা ধরতে পারলেন তাদের সাথে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি প্রয়োগ করা হচ্ছে। তখনই তারা বেঁকে বসেছিল। শুরু করেছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। তাদের আন্দোলনে টিকতে না পেরে অবশেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে বৃটিশরা। এই তত্ত্বের চাষ বৃটিশদের আগে রোমে হয়েছিল বলেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দিকে রোমে সবেমাত্র প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হচ্ছিল। যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ দাস মালিক ও অভিজাতভিত্তিক। জমি দখল করার উদ্দেশ্যে রোমবাসীরা প্রায়শই তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে থাকত। অ্যাপেনাইন উপদ্বীপে তখন অন্তত ১২টি জাতি বসবাস করত, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়শই শত্রুতা লেগে ছিল। তাদের সাথে রোমের সংগ্রাম চলেছিল দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে। রোমের লোগিও বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে শত্রু অপেক্ষা পারদর্শী ছিল! প্রতিবেশী জাতিগুলোর বাহিনী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় রোমের যুদ্ধাভিযান তারা প্রতিহত করতে পারেনি। ইতালির বিভিন্ন জাতিকে একের পর এক পদানত করেছিল রোম। বিজিত অঞ্চলের শস্যক্ষেত্র ও পশুচারণভূমি রোমবাসীরা দখল করে নেয়। দখলকৃত এসব জমির একটা অংশ চলে যেত অভিজাতদের হাতে। আর যা বাকি থাকে তার উপরে রোমের কৃষকদের যাদের জমিজমা কম ছিল তাদের বসিয়ে দিয়ে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। বিজিত অঞ্চলে গড়ে তোলা এই উপনিবেশগুলো রোমের আধিপত্যের খুঁটি হিসেবে কাজ করত। বিজিত জাতিগুলোর মধ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে ঝগড়াবিবাদ জিইয়ে রাখতো রোমের শাসকরা; উদ্দেশ্য-যাতে সুসংহত হয়ে সম্মিলিতভাবে রোমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিহাস বলে- একই ভূখণ্ডে যখন একাধিক জাতি বসবাস করতে শুরু করে তখন আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাত সিন্ধু সভ্যতার আগন্তুক আর্যদের সাথে আদি অধিবাসীদের হয়েছে। ইউরোপ থেকে দলে দলে পাড়ি জমানো শ্বেতাঙ্গদের সাথে আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করা আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদেরও হয়েছে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এই দ্বন্দ্ব এক সময় বিলিন হয়ে যায়। ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন ঐতিহ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতিসত্তা পাশাপাশি সহাবস্থান করে গড়ে তোলে এক বৃহত্তর মানবসমাজ।

> "এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, আবার উগ্র জাতীয়তাবাদও নয়। এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ হলো প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদের মূল আদর্শ হলো মানবতা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিজেদের পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই জাতীয়তাবাদ। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিজেদের পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কোন জাতির মৌলিক অধিকার।

২.

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে মরণ ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অব্যাহত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাহাড়ে বসবাসরত পাংখো, খুমি, লুসাই, ম্রো, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমাসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে এম এন লারমার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ছোট ছোট জুম্ম জাতিসমূহকে বেঁচে থাকতে হলে সবাইকে এক হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। তাই তিনি নিয়ে এলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের এগারটি ছোট ছোট জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনার মূলমন্ত্র 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'।

এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়, আবার উগ্র জাতীয়তাবাদও নয়। এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ হলো প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদের মূল আদর্শ হলো মানবতা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিজেদের পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই জাতীয়তাবাদ। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিজেদের পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কোন জাতির মৌলিক অধিকার। জুম্ম জাতীয়তাবাদ এই অধিকারকে ধারণ করে ও বিশ্বাস করে। জুম্ম জাতীয়তাবাদ কারোর অধিকার হরণ করার জন্যে নয়, জুম্ম জাতীয়তাবাদ কারোর করুণার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার জন্যে নয়, জুম্ম জাতীয়তাবাদ হলো ছোট ছোট জাতিসমূহের মানবিক মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে পাহাড়ে গড়ে উঠেছিলো ইস্পাত কঠিন ঐক্যের দেয়াল। এই ঐক্যের দেয়াল শাসকগোষ্ঠীর কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। এই ঐক্যের দেয়াল ভাঙার জন্য তারা ব্রিটিশ কিংবা রোমের শাসকদের মত তারাও ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি প্রয়োগ করে এসেছে বারবার। জুম্ম জাতীয়তাবাদের ঐক্যের দেয়ালে প্রতিটি শাসক একের পর এক আঘাত করে গেছে। জিয়াউর রহমান সরকার জুম্ম জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য সত্তর দশকে সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারি দালাল সংস্থা 'ট্রাইবেল কনভেনশন'। ঐ ট্রাইবেল কনভেনশনকে পরিচালনা করতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ট্রাইবেল কনভেনশনের জনসভায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবশ্যই উপস্থিত হতে হতো। অন্যথায় বেতন-ভাতা বন্ধ হতো। হেডম্যান, কার্বারী, চেয়ারম্যান-মেম্বারদেরও ট্রাইবেল কনভেনশনের জনসভায় যোগদান করতে হতো বাধ্যতামূলকভাবে। এরপর গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। উন্নয়ন বোর্ডের গোপন উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা ও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে আনা বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত পুনর্বাসন প্রদান করা। তারপর তথাকথিত আদর্শ গ্রাম ও যুক্ত গ্রাম স্থাপন করা হয় যেখানে জুম্মদেরকে জড়ো করা হয়। জুম্মদের চিরায়ত গ্রাম থেকে জোরপূর্বক তুলে এনে এ ধরনের আদর্শ ও যুক্ত গ্রামে জোরপূর্বক বসতি প্রদান করা হয়। এভাবে সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে তৎসময়ে আন্দোলনরত শান্তিবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল সেনাবাহিনী।

এভাবেই জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকার এবং তার পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ সরকার জুম্ম জাতিসমূহের মধ্যে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তাদেরকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে জাতিগত বিভেদ উস্কে দিতে থাকে। বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত করে জুম্ম জাতিসমূহের মধ্যে, বিশেষত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জাতিসমূহের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার মধ্য দিয়ে শাসকশ্রেণি ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছিল এবং জুম্ম জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামে বিভক্ত রেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছিল।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের ঐক্যর কফিনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শাসকগোষ্ঠী সবচেয়ে জঘন্য পেরেকটি ঠুকে দেয় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর। দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালাল ও শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে নিজেদের হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে, একশ্রেণির ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃস্থানীয় সদস্য আন্দোলনের বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে এবং নিজেদের দুর্বলতা, দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহার ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে, সর্বোপরি ক্ষমতায় উচ্চভিলাষী হয়ে জনসংহতি সমিতির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় নিয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করতে থাকে। এই উপদলীয় চক্রান্তের হোতা হলো- প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) ও দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)। দেশী-বিদেশী, আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের খপ্পরে পড়ে এদের সঙ্গে চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ), সনৎ কুমার চাকমা (সাগর) প্রমুখ সদস্যবৃন্দও।

তারই ধারাবাহিকতায় ১০ নভেম্বর ৮৩ সালে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকরা, প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র অতর্কিত হামলা পরিচালনা করে জাতীয় ইতিহাসে এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছিল। বিপথগামীরা জুম্ম জাতীয়তাবাদের জনক, পাহাড়ে মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা এম এন লারমা'কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। সেই সাথে নিভিয়ে দিল মুক্তির স্বপ্নে বিভোর এক ঝাঁক তারার আলোকিত স্বপ্নকে। মহান নেতা এম এন লারমার সাথে সেদিন শহীদ হয়েছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা ৮ জন বীর। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট এ ঘৃণ্য চক্রান্তের কারণে জুম্মদের জাতীয় জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা আমরা আর কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যার ফলশ্রুতিতে আমরা জুম্ম জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় বিভেদপন্থীদের চাপিয়ে দেয়া গৃহযুদ্ধ পেয়েছি। সেই যুদ্ধে শত-শত বাপ ভাই হারিয়েছি, হারিয়েছি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরদর্পে বুক চিতিয়ে লড়ার সক্ষমতা। এম এন লারমাকে হারিয়ে সেদিন জুম্ম জনগণ শোকে কাতর হয়েছিল, মুক্তির আকাশ কালো আঁধারে ছেঁয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিভেদের দেয়ালকে চূড়ান্ত রূপ দিতে পেরেছে বলে শাসকগোষ্ঠী অট্টাহাসিতে ফেটে পড়লেও জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। তার ফলে গৃহযুদ্ধ-উত্তর সময়ে বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩.

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়ে ১৯৮৯ এর ২০ মে গঠিত হয়। নিপীড়ন নির্যাতন ও শোষণ বঞ্চনার পাহাড় ভাঙার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে লড়াই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদী নতুন প্রজন্ম। জুম্ম তরুণ ছাত্র সমাজের এই ঐতিহাসিক ও সময়োপযোগী উত্থানে শোষক-শাসকগোষ্ঠী হতচকিত হয়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা হরণকারী সেনা আমলারা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এই উত্থানকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি গণপরিষদ অবিচলভাবে সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন ও কুকীর্তির চিত্র দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে, প্রতিবাদ জানায় ও এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনপ্রতিবাদ গড়ে তোলে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামরত পাহাড়ি গণ পরিষদ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার ও সেনাবাহিনী নানান ষড়যন্ত্র ও পুনরায় চক্রান্তের জাল বুনতে থাকে।

নতুন পরিস্থিতিতে পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার চাঁদাবাজী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িত সন্ত্রাসীদের নিয়ে পিপিএসপিসি নামক মুখোশবাহিনীর জন্ম দেয়া হয়। সেনা সৃষ্ট তথাকথিত

পিপিএসপিসি সন্ত্রাসী গুন্ডাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ও কাজ ছিল মুখোশধারীদেরকে পিজিপি, পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে তিন সংগঠনকে ঘায়েল করা। তিন সংগঠনকে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া। জন্মের পর থেকে সেনাবাহিনীর ঔরসজাত পিপিএসপিসি মুখোশধারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষত খাগড়াছড়িতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে রাতের আঁধারে পাহাড়ি গণ পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের উপর চড়াও হয়েছিল। জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য চিহ্নিত সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ব্যবহার করার কৌশল নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে ইনসার্জেন্সী দমনের নামে প্রতি বিপ্লবী কৌশল হিসাবে এই কৌশল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেও এর আগে তথাকথিত টাইগার বাহিনী, লায়ন বাহিনী, গ্রাম প্রতিরোধ কমিটি বা গুরক বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল যার প্রত্যক্ষ মদদদাতা ছিল শাসকগোষ্ঠী।

১৯৯৬ সালে শাসকগোষ্ঠীর ঔরসজাত সন্তান মুখোশ বাহিনীকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুর্বার পথচলাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার পর শাসকগোষ্ঠী নতুনভাবে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে পাহাড়ে 'ইউপিডিএফ' নামের নতুন সংগঠনের জন্ম জুম্ম জাতীয়তাবাদের উপর আঘাত হানে। সেনাবাহিনী তথা শাসকশ্রেণির ছত্রছায়ায় তারা জনসংহতি সমিতিকে জাতীয় বেঈমান ঘোষণা করে। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা যখন অস্ত্র জমাদানের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পে আসতে শুরু করে তখন তাদেরকে নানান কায়দায় লাঞ্ছনা ও উত্যক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন জায়গায় জনসংহতি সমিতির জন্য শ্মশান ও চিতা তৈরি করে রাখে। তারা জনসংহতি সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করে। ইউপিডিএফ সৃষ্টির পরে চুক্তির বিরোধিতা ও বাতিল করার কর্মসূচি বাস্তবায়নের নামে সশস্ত্র হামলায় অনেকে অকালে প্রাণ হারিয়েছিল, অনেকেই পঙ্গু হয়েছিল, নিঃস্ব হয়েছিল অনেকেই। ইউপিডিএফ সৃষ্টির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে অনৈক্যের বীজ বপন করা হল ক্রমে ক্রমেই তা সুবিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়। জুম্ম জনগণের মুক্তির আন্দোলন আরও একবার খাদের কিনারায় চলে গেল। চুক্তিকে কেন্দ্র করে গোটা জুম্ম ছাত্র সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- চুক্তিপক্ষ ও চুক্তিবিরোধী। এই বিভাজন কেবল ছাত্র সমাজের মধ্যে নয়, জুম্ম সমাজের একটা অংশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পথচলায় যে একটি বড় ধরনের হোঁচট ছিল সে বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। ২০০৭ সালের এ জরুরি অবস্থার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও একটি সংকটকালীন মুহূর্ত অতিক্রম করেছিল। এই সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীর অঙ্গুলি হেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো একটি বিভাজনের দেয়াল তোলা হয়। জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে বিভিন্ন উপদল সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির চর্চা করা হচ্ছিল। 'দুই নেত্রী মাইনাস' তত্ত্বের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও সন্তু লারমাকে মাইনাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার লালসায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি আপোষকামী অংশ সেনাবাহিনীর সাথে আঁতাত করে 'জেএসএস সংস্কার' নামের আরো একটি সংগঠনের জন্ম দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে অধিকতরভাবে দুর্দশার জন্ম দিয়েছিল।

৪.

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে শাসকশ্রেণি জুম্ম জনগোষ্ঠীকে বিভেদ করার লক্ষ্যে ভিন্ন আঙ্গিকে ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা করে চলেছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ৩০ জুন ২০১০ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান পরিস্থিতির উপর ১৪টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহের 'মূলধারার রাজনীতি চর্চা' শীর্ষক ১৪ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয় যে, 'দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো কেন্দ্রীয় নেতাদের সমন্বয়ে সমতল এলাকার মত পার্বত্য জেলাগুলোতেও জাতীয় ইস্যু নিয়ে নিয়মিতভাবে কর্মসূচি আয়োজন করতে পারে। এতে শুধুমাত্র পার্বত্য ইস্যুভিত্তিক রাজনীতির বাইরেও দেশের মূলধারার রাজনৈতিক চর্চা গতিশীল হবে এবং আঞ্চলিক দলগুলোকে মূলধারায় ক্রমশ সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যেন পার্বত্য এলাকায় উপজাতি ও বাঙালি জনগণের মাঝে ঘন ঘন সফর/সাক্ষাৎ ও নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন, এজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।'

এই কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো, যে কোন উপায়ে জুম্ম জনগণকে জাতীয় রাজনীতির মুলস্রোতধারায় নিয়ে এসে দালাল সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণের পথ প্রশস্ত করা এবং এই দালালগুলোকে দিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী ইতিমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ব্যাপক পরিমাণে টাকা ঢেলে আওয়ামীলীগ-বিএনপি বিভিন্ন এলাকায় কর্মী সংগ্রহের নামে দালাল সৃষ্টি করার জন্য করতে মাঠে নেমেছে। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে জুম্ম জনগণের সুবিধাবাদী অংশটা শাসকগোষ্ঠীর পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো মৌলবাদী-ডানপন্থী নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে চললেও এবং জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেলেও একশ্রেণির জুম্ম সেসব দলের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে শাসকগোষ্ঠীর চুক্তি-বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করে চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট এ দালালগুলো অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জুম্মবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই দালালগুলোকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী তার ফায়দা লুটে চলেছে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দালালরা বৈধ অবৈধ সব ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে, শাসকদের মদদে বনজসম্পদ পাচার করে দিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে মেম্বার, চেয়ারম্যান হয়ে জুম্ম জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে চলেছে।

দ্বিধান্বিত জুম্ম মধ্যবিত্ত ছাত্র সমাজকে বিরাজনীতিকরণের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনগুলো জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিরূপ ভূমিকা রাখছে কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গজিয়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনগুলো জুম্ম জাতীয়তাবাদে সূক্ষ্ম বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই সামাজিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলেও সাধারণত এই সংগঠনের সদস্যরা অনেকেই রাজনীতিবিমুখ বা অধিকার আদায়ের জন্য শোষিত শ্রেণির রাজনীতিতে যুক্ত হতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শ ভিত্তিক জুম্ম ছাত্রদের এই সংগঠনের সদস্যরা একে অপরের সাথে উচ্ছৃঙ্খল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র সামাজিক আবেদন নিবেদন বা সভা সেমিনারের মধ্যে নিজেদের সদিচ্ছাকে সীমাবদ্ধ রাখলে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। কারণ রাজনৈতিক অধিকার না থাকলে সামাজিক অধিকার চর্চা করা দুরূহ ব্যাপার। আদিবাসী জুম্মদের এই সংগ্রামকে কেন আজ খণ্ডিত করা হচ্ছে? কেনইবা জুম্ম ছাত্র সমাজকে রাজনীতিবিমুখ করে ‘I hate politics’ প্রজন্ম সৃষ্টি করা হচ্ছে? এতে কার লাভ? এগুলো নিয়ে হিসাব কষার সময় এসেছে।

আজ রাষ্ট্রীয় বাহিনী জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে টার্গেট করে নানামুখী ষড়যন্ত্র করে চলেছে। জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিতে প্রশাসনের নাগের ডগায় ইয়াবা-গাজা-হেরোইনসহ মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীরা সক্রিয় হলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখনও পাহাড়ে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক তামাকের চাষ হচ্ছে। যেগুলো প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে রয়েছে। এই একই কারণে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি শহরে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যার কারণে পাড়ায় পাড়ায় অবাধে মদের দোকানে জমজমাট ব্যবসা চলছে। পাহাড়ের শহর-জনপদে মদের জোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্দার আড়ালে বা বাইরে মাদকদ্রব্যর সহজলভ্য বেচাকেনা চলছে। যাতে করে গোটা জুম্ম ছাত্র ও যুব সমাজকে নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন রেখে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়, সামাজিক দায়বোধহীন প্রজন্ম তৈরি করা যায়।

৫.

দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে শত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী ডিভাইড এন্ড রুল পলিসির নব্য প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। গত ১০ মে ২০১৭ বান্দরবানের লামা উপজেলায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তথাকথিত মুরং নেতাদের দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর সহাযোগিতা নিয়ে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। সেনা মদদ পুষ্ট বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে উক্ত সংবাদটি বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়। মূলত লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে হাজার হাজার একরের ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়াকে আড়াল করার জন্য সেনাবাহিনীর যোগসাজেসে মুরংদের একটি অংশকে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং পূর্বের মতো পুনরায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের ঐক্যের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ জুম্মদের জাতীয় জীবনে নেতৃত্বে গঠনের সুতিকাগার। জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক আন্দোলন সংগ্রামে পাহাড়ের সকল জাতিগোষ্ঠীর অগ্রবর্তী ছাত্রদের অংশগ্রহণ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গৌরবময় ইতিহাসকে বলীয়ান করেছে। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে অনেক বীর সেনানী বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছিল। অকাতরে জীবন দিয়েছিল রূপম, সুকেশ, মনতোষ, সনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা, মংসচিং মারমা, লাল রিজার্ভ বমসহ আরো অনেক প্রতিবাদী ছাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সংগঠনটি কৃতিত্বের সাথে রাজপথে লড়ে যাচ্ছে। তাই শাসকগোষ্ঠীর কাছে এ সংগঠনটি টার্গেটে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে বরাবরই বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে। শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য অনেকেই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে ‘চাকমাদের সংগঠন’ বলে অপপ্রচার করে চলে চলেছে। পিসিপির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামে ভীত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া দালালরা ছাত্রদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘চাকমা ছাত্র পরিষদ’ নামে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উত্থান আমরা দেখতে পেয়েছি। জুম্ম জাতীয়তাবাদে ফাটল ধরানো এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কঠোর হস্তে দমন করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুনভাবে সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উত্থান এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের খুচরো সংগঠন বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাদের কাউন্সিলে ক্ষমতাসীন দলের এমপি মন্ত্রীদের দেখা যায়। এই সংগঠনগুলোর গুটিকয়েক ছাত্র দাপট দেখানোর জন্য তথা রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্য ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন জাতীয় রাজনীতির দলগুলোতে নাম লিখাচ্ছে। যার ফলে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্ট সাধারণ দ্বন্দ্বগুলোও রাজনীতিকীকরণ হচ্ছে। যার ফায়দা লুটছে শাসকগোষ্ঠী। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন মারমা ছাত্রের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে চাকমা ও মারমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবে অপপ্রচার করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ত্রিপুরা ও চাকমা শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বন্দ্বকে ত্রিপুরা-চাকমা দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখানো হয়েছে। অবিলম্বে এই ধরনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে জুম্ম ছাত্ররা সরে আসতে না পারলে পাহাড়ে বৈচিত্র্যকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী ফায়দা লুটে জুম্ম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিভেদের নতুন দেয়াল নির্মাণ করবে সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এম এন লারমা তাঁর নিজের হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে বলতেন, ‘দেখো, পাঁচটি আঙ্গুল। এক আঙ্গুলে খোঁচা মারার চেয়ে এক মুষ্ঠিতে ঘুষি মারলে শক্তি ও জোর দু'টোই বেশি হয়।' তিনি আরো বলতেন, ‘আমাদের এই জোর-শক্তি লুকিয়ে আছে বৈচিত্র্যের ঐক্যতানে সমৃদ্ধ আমাদের জুম্ম সংস্কৃতির মধ্যে। শুধু প্রয়োজন সেই জোর-শক্তিকে সঠিকভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগানো।' যুগ যুগ ধরে পাহাড়ে শোষণ বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর ‘ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসি মোকাবিলা করার জন্য পাহাড়ে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলোকে মহান নেতা এম এন লারমা'র দেখানো পথে হেঁটে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

বিশেষ প্রতিবেদন

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৭৮তম জন্মদিবস পালিত

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা ও মহান বিপ্লবী, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, প্রাদেশিক পরিষদ, গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেলের চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় এবং অন্যতম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহান নেতার সহোদর, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, জুম ইসথেটিক্স কাউন্সিল ও আদিবাসী লেখক ফোরামের সভাপতি শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা প্রমুখ। আলোচনা সভায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা ও গিরিসুর শিল্পগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক আনন্দ জ্যোতি চাকমা।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আলোচনা সভা ছাড়াও মহান নেতার স্মরণে রাঙ্গামাটি জেলা সদরস্থ এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা এবং দেবাশীষনগরস্থ এম এন লারমা স্মৃতি গণপাঠাগার, কল্যাণপুরস্থ রাণী বিনীতা রায় পাঠাগার ও ক্লাব, রাঙাপানিস্থ বলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, রাজদ্বীপ এলাকাস্থ ইদঘর বইও তাল পাঠাগার এবং সদর উপজেলাধীন জীবতলিস্থ এম এন লারমা স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আলোচনা সভাসহ শিশু-কিশোরদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় বলেন, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব ও নেতার বিষয়ে বলা মোটেই সহজ নয়। প্রথমত এম এন লারমার জীবনালেখ্যের বিষয়ে আমার জানা ও বোঝার মধ্যে এখনও অনেক বড় ফাঁক রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত আমি যাকে নিয়ে কথা বলছি, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার নেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়।' তিনি আরও বলেন, 'আরেকটি মৌলিক বিষয় হলো- তিনি ছিলেন একজন নীতিনির্ধারক ও পদপ্রদর্শক। 'আমি বাঙালি নই, আমি চাকমা'– এটা বলে তিনি গণপরিষদে এবং জাতীয় সংসদে যে বক্তব্যগুলো রেখেছিলেন এবং যে আইনী প্রস্তাবাবলী পেশ করেছিলেন তাতে অন্তর্নিহিত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-আদিবাসী জাতিসমূহের সামষ্টিক রাজনৈতিক সত্তা এবং একটি বহুমাত্রিক, বহু সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম তাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ।'

অন্যতম আলোচক হিসেবে তাঁর বক্তৃতায় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, 'এম এন লারমার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রেণিহীন-শোষণহীন একটি সমাজজীবন নিশ্চিত করা, যে

সমাজজীবনে জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, লিঙ্গভেদ থাকবে না, থাকবে না অর্থনৈতিকসহ সকল প্রকারের ভেদাভেদ। যে স্বপ্ন তিনি শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ও সমগ্র বিশ্বকে ঘিরেই দেখেছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে বাংলাদেশের সরকার, শাসকগোষ্ঠী তাঁর সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তথা পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারসমূহকে নির্মমভাবে পদদলিত করে চলেছে। যে কারণে আজকে আমরা সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করতে পারছি না। আজকে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপর আকাশ নেই। তাদের জীবন আজকে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনীতিগত তথা সকল প্রকারের শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে।'

> এম এন লারমার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রেণিহীন-শোষণহীন একটি সমাজজীবন নিশ্চিত করা, যে সমাজজীবনে জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, লিঙ্গভেদ থাকবে না, থাকবে না অর্থনৈতিকসহ সকল প্রকারের ভেদাভেদ। যে স্বপ্ন তিনি শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ও সমগ্র বিশ্বকে ঘিরেই দেখেছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে বাংলাদেশের সরকার, শাসকগোষ্ঠী তাঁর সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তথা পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারসমূহকে নির্মমভাবে পদদলিত করে চলেছে। যে কারণে আজকে আমরা সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করতে পারছি না।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, আজকে যদি আমরা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনী আলোচনা করি- তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমাদের শিক্ষিত সমাজ যারা আমাদের আশেপাশে আছেন তাদের যদি আমরা একটা তুলনামূলক চিত্র দেখি- আমার একটা কথা মনে পড়ে যা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন- আমরা কোনমতে একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করি, সার্টিফিকেট যোগার করে একটা লোভনীয় চাকরিতে নিয়োজিত হই। এরপর কর্মজীবন শেষ করি এবং সার্টিফিকেট এর মেয়াদ সেখানে শেষ। তারপর আমরা ঘরে বসে দেশ, জাতি নিয়ে আলোচনা করি। দেশ, জাতির উন্নতির কোন কাজ না করে শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিই।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একজন শিক্ষক ছিলেন, আমিও একসময় শিক্ষকতা করেছি। তখনকার সময়ে ম্যাট্রিক পাশ করলে যেভাবে হোক একটা চাকরি জোটে। এম এন লারমা যে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন সেই যোগ্যতা নিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরকম কিছুই চিন্তা করেননি। তিনি ছাত্রজীবন থেকে দেশ ও জাতির কথা ভেবেছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনে হোস্টেলে থাকাকালীন সময়ে কাপ্তাই বাঁধ নিয়ে লেখালেখি করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। পত্রিকার মারফত হয়তো আপনারা সবাই জানতে পেরেছেন যে কাপ্তাই বাঁধের ফলে যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদেরকে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্ব দেয়ার রায় দিয়েছেন। ভারতের অরুনাচলসহ বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে দুঃখ-দুর্দশা, দুর্বিষহ জীবন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান গেলো বাংলাদেশ আসলো, দীর্ঘ সংগ্রাম করলো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ। ছাত্র-জনতার দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে একটা চুক্তি হলো, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু সেই চুক্তি আজও বাস্তবায়ন হয়নি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে চুক্তি হয়েছে, আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু কোনটার মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কথা বলেননি, জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি দেশের সকল পেশাজীবী মানুষের কথা বলেছিলেন। তাই তিনি অন্যতম একজন নেতা হিসেবে স্বীকৃত। তার যে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, তিনি যে কাজগুলো সমাপ্ত করে যেতে পারেনি সেগুলো বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আরো পরিশ্রমী হতে হবে এবং কাজ চালিয়ে যেতে হবে, সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। আদিবাসী হিসেবে আমাদের যে অধিকার তা অর্জন করতে আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, আমি খুবই আনন্দিত যে এখানে আমার পুরোনো সঙ্গী-সহপাঠীদের দেখে। এ ধরনের উপস্থিতি দেখে আমাদের প্রেরণা জাগে। পরিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরামের সভাপতি শিশির চাকমা বলেন, সেই সত্তর দশক আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এই জাতিগুলোকে একই ছাদের নিচে ঐক্যবদ্ধ করার যে চ্যালেঞ্জ, তার জন্য জুম্ম জাতীয়তাবাদের যে চিন্তাধারা, এই স্বপ্নের রচয়িতা ছিলেন এম এন লারমা এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধার আসন রেখে দিতে হবে। আজকে আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য, সর্বোপরি আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। এম এন লারমা বুঝতে পেরেছিলেন যে,

আমার ভাষা, আমার সংস্কৃতি, আমার ঐতিহ্য এবং অধিকার যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে আমাদের জন্য ভবিষ্যত সুখকর হবে না। আমি জানি তিনি যতগুলো চিন্তা-ভাবনা ধারণ করেছিলেন তৎকালীন সময়ে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা সেটাকে ধারণ করতে পারিনি। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে বর্তমানে যে সংকটগুলো আমরা দেখি, সেগুলো উত্তরণ ঘটানোর জন্য আমরা এম এন লারমাকে খুঁজি। তাকে তো আমরা পাবো না, তিনি তো আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ ও সংগ্রাম আমাদের মাঝে এখনো রয়েছে।

আমরা দেখেছি পঁচাত্তর-উত্তর যে সরকারগুলো এসেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যারা জাতীয় সংসদে ছিলেন, জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের চোখের সামনে আমাদের আত্মপরিচয় ভুলণ্ঠিত করা হয়, আমাদেরকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেটা এখনো পার্বত্যবাসী মেনে নেয়নি আমরা এখনো মানতে পারি না, তারা নির্লজ্জভাবে পার্লামেন্টে বসে দেখেছিলেন। কিন্তু তারা প্রতিবাদ করতে পারেননি, এর চেয়ে দুঃখের কি আছে? আমাদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে, জাতিসত্তা সম্পর্কে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে, তখন কি তাদের প্রতিবাদ করার দরকার ছিল না? সেদিন যদি তারা একাত্মা হয়ে প্রতিবাদ করতে পারতেন আজকে হয়তো আমাদের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে অন্য একটা ব্যাপার ঘটতে পারতো। কিন্তু ঘটে নাই। তারা শুধু নিজের আঁখের গোছাবার জন্য এবং মূল স্রোতধারার সুবিধাবাদী রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য আমাদের অধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের টিকে থাকার যে প্রচেষ্টা সেটা মোটেই সুখকর নয়।

এম এন লারমাকে অনেক সুবিধার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু লারমা লারমাই, তিনি ব্যক্তি সুবিধা চাওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেননি, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অধিকারের জন্যই তাঁর আন্দোলন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জন্য স্বপ্ন দেখেছেন যদিও সেটা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। কিন্তু তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন, যে পথ তিনি দেখে গেছেন সেই পথে যদি আমরা হাঁটতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হয়তো সুখকর হতে পারে। তারপরেও আমি অন্ধকার দেখি। আমাদের আত্মতুষ্টিতে থাকা ঠিক হবে না। যারা আমরা বাড়ি করছি, গাড়ি কিনছি, সন্তান-সন্ততির জন্য চাকরি খুঁজছি, আমরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি একটা কথা বলে রাখি- পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সংকট সেটা যদি স্থায়ীভাবে নিরসন করতে না পারি তাহলে আমাদের সেই সম্পদ, চাকরি-বাকরি নিরাপদ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা বলেন, পাকিস্তান সরকার আমাদের চিরতরে ধ্বংস করার জন্য, সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করেছিল। সেখানে বাঁধ না হলে আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম। যে বাঁধের ফলে আমাদের চুয়ান্ন হাজার একর জমি জলমগ্ন করে দিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার মানুষ ভারতে ও বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়। অনেকেই তারা এখনও নাগরিকত্বহীন অবস্থায় জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

সংগ্রামী বন্ধুরা, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সেই ইসলামী সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণ করে আমাদের উপর দমন-পীড়ন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আজ আমাদের এই আন্দোলন-সংগ্রাম, এই আন্দোলন-সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং সেই সংগ্রামের ফসল আজকের এই পার্বত্য চুক্তি। যে চুক্তির সুবাদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পুরস্কার লাভের পর বেমালুম ভুলে গেছেন তার প্রতিশ্রুতির কথা, চুক্তিতে যা লেখা ছিল তাও ভুলে গেছেন। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেননি, বেঈমানী করেছেন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে প্রতারণা করছেন। চুক্তির অন্যতম মৌলিক বিষয়- ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দেননি। আমাদের জাতীয় পরিচয় মুছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ও ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আমাদেরকে বাঙালি বানানো হয়েছিল কিন্তু আমরা জুম্ম জাতি জুম্ম পরিচয়ে থাকতে চাই, আমরা নিজস্ব পরিচয়ে, নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ইসলামী সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নে এখানে সেটেলার বসতিস্থাপন করেছিল, যে সেটেলাররা প্রতিনিয়ত আমাদের জুম্ম নারীদের সম্ভ্রম কেড়ে নিচ্ছে, খুন করছে, জায়গা-জমি কেড়ে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে হলে আমাদেরকে আরো অধিকতর সংগ্রামী হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য যেভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছিল চুক্তি বাস্তবায়নে ততোধিক আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

আমাদেরকে জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে পুরো বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে চায় শাসকগোষ্ঠী। আমাদের বাঁচার অধিকার, ভূমি অধিকার, মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে তারা তাদের হীন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এই হীন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে হলে আমাদের আরো অধিকতর সংগ্রাম করতে হবে। যারা এখনো আমাদের আন্দোলন প্রক্রিয়ার বাইরে আছেন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বর্তমান সময় সেটাই দাবি করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আজকের এই ৭৮তম জন্মদিবসে আমরা একে একে যদি তাঁর কথা বলেও থাকি তবু তা শেষ হবে না এবং তাঁর সম্পর্কে বলার যেন শেষ নেই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে চিন্তাধারা, তাঁর যে নীতি-আদর্শ, দেশ প্রেম, ছাত্রজীবন থেকে তাঁর যে সংগ্রামী ভাবধারা তা আমরা কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারি না। ষাট দশকে যখন আমাদেরকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র চলছিল সেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে, তিনি তখনই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি তৎকালীন ছাত্র-যুব সমাজকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার শাসকগোষ্ঠীর যে ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা তাও তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এসব ভূমিকা দেখেই আমরা তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, চিন্তা-চেতনা ও নেতৃত্বের দক্ষতা উপলব্ধি করি।

আমি বিশ্বাস করি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন সময়ে যেভাবে সেই ঘুণেধরা সামন্ত সমাজের ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন

সেভাবে যদি বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজ গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে জুম্ম জনগণকে সংগঠিত করতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো।

আজ এম এন লারমা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর নীতি-আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও নির্দেশনা রেখে গেছেন। এম এন লারমা যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ ধরে এবং তাঁকে অনুসরণ করে ছাত্র-যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা বলেন, 'আমি বাঙালি নই'– এই কথাটি মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন তৎকালীন গণপরিষদের সংসদ অধিবেশনে। আজকে আমি যে এখানে সুমন মারমা পরিচয় নিয়ে বক্তব্য দিতে পারছি একমাত্র এম এন লারমা 'আমি বাঙালি নই' বলে যে প্রতিবাদ করেছিলেন সেই আত্মপরিচয়ের অধিকারের প্রেক্ষিতে। আজ মহান নেতার ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা সভা হচ্ছে। আজকে তাঁর ৭৮তম জন্মদিবসে এই শিল্পকলা একাডেমি থেকে নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় বলতে পারছি যে, 'আমরা বাঙালি নই'।

তৎকালীন সময়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া পরিচয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন। আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিই। আজকে আমাদের ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ সেই এম এন লারমার নীতি-আদর্শ থেকেই আমরা শিক্ষা নিয়ে থাকি। আজকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তার চিন্তা-চেতনা, ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র-যুব সমাজ নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তৎকালীন সময় থেকে শাসকগোষ্ঠী যে অপচেষ্টা চালিয়ে ছিল তার বিরুদ্ধে এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি শুধু আমাদের আত্মপরিচয়ের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি বাংলাদেশের আপামর জনগণের কথাও বলেছিলেন। তিনি যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কথা বলেছিলেন তেমনি চেঙ্গী, মাইনী, কর্ণফুলী, মাতামুহুরীর কথাও বলেছিলেন। তিনি যেমনি আমাদের আত্মপরিচয়ের কথা বলেছিলেন তেমনি সমগ্র বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি, তিনি একজন অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তাকে নিয়ে কোন বিতর্কই নেই।

বর্তমানে আমাদের পার্বত্য চুক্তি বাস্তয়নের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে ছাত্র-যুব সমাজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, তাঁর নীতি-আদর্শ ও দর্শনের শিক্ষা নিয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে

সামনে এগিয়ে যাবে। সুতরাং আজকে যে মহান নেতার জন্মদিবস পালিত হচ্ছে এই জন্মদিবসের মধ্যদিয়ে ছাত্র-যুব সমাজ তাঁর চিন্তা ও চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অধিকতরভাবে সংগ্রামে যুক্ত হবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ সকলকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা তাঁর সভাপতির বক্তব্যে বলেন, আমাদের নেতাকে নিয়ে বলার কোন শেষ নেই। তবুও আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু স্মৃতি এখানে আমি তুলে ধরবো যা আমার এখনও আমার হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে আছে। প্রথম আমাদের নেতার সাথে আমার দেখা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তিনি সেই সময় পাকিস্তানের শেষ নির্বাচন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এবং জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সম্ভবত ক্যাম্পেইন করতে গিয়েছিলেন রুমাতে। সেই সময় আমার বড় কাকা রুমার সার্কেল অফিসার ছিলেন। তখন মাত্র দুই দিনের জন্য আমি ওনাকে দেখেছি। আমার কাকার সাথে অনেক আলোচনা করে, ঐ এলাকার মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে তিনি চলে আসেন। সেই প্রথম আমার এম এন লারমার সাথে দেখা। তখন আমি ছোট ছিলাম।

এরপর সংগ্রামী জীবনে উনার সাথে আমার দ্বিতীয় দেখা। ১৯৭৩ সাল, বর্তমান ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে একটা মিটিঙে ওনার বক্তব্য আমি প্রথম শুনি। তারপর তৃতীয়বার উনার সাথে আমার দেখা সংগ্রামী জীবনে ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ আমার এখনও মনে আছে আমরা ওখানে পৌঁছেছি। ওখানে প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। এই দুই সপ্তাহে উনার সাথে এখনও অনেক স্মৃতি আমার সাথে জড়িয়ে আছে। আমাদের ঐ ক্যাম্পে আশীষ চাকমা নামে এক কমান্ডার ছিলেন। আশীষ চাকমার সাথে আমি থাকতাম। তিনি আমার সিনিয়র ছিলেন। আমার যে ঘাটে স্নান করতাম একদিন সেই ঘাটে তিনি যখন স্নান করতে যান আমিও তখন স্নান করতে গেছি। সেখানে ঘাটের পাশে জঙ্গলী কলাগাছ কতগুলো মুখ থুবরে পড়ে আছে। তিনি সেগুলো ভালো করে দেখলেন, কিছু বললেন না। এরপর তিনি স্নান করে নিজের পানির চোঙাটায় পানি ভরে সেটা নিয়ে ব্যারাকে চলে আসলেন। চলে আসার পরে আশীষ চাকমাকে ডাকলেন। বলেন, আশীষ, তুমি কি কলাগাছগুলোকে মেরেছ? আশীষ চাকমা বলে যে, হ্যাঁ স্যার। আবার প্রশ্ন করেন, কেন মেরেছ? আশীষ চাকমা বললেন, আমি বক্সিং প্র্যাকটিস করেছি। তিনি বললেন, বক্সিং তুমি প্র্যাকটিস করলে বস্তার মধ্যে বালু ঢুকিয়ে প্র্যাকটিস করবে। কিন্তু কলাগাছগুলোকে তুমি কেন মারলে? কলাগাছগুলো থেকে আর কলা হবে না। কলাগাছগুলো স্বাভাবিকভাবে বাড়লে সেখানে কলা হবে, কলাগুলো পাকবে। এগুলো তো আমরা খাই না। এগুলো খাবে পাখিরা। প্রকৃতিকে প্রকৃতির মত থাকতে দাও। তিনি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের ব্যাপারে কতটা সচেতন ওখানে তখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

১৯৮৩ সালে তখন আমাদের মধ্যে বিভেদপন্থীদের চাপিয়ে দেয়া গৃহযুদ্ধ চলছিল। তখন মহান নেতাসহ আমরা একসঙ্গে থাকতাম। আমাদের একটা পাকঘর ছিলো। পাকঘরে আমরা সবাই গিয়ে ভাত খেতাম। উনিও গিয়ে খেতেন। কেউ কোনদিন উনার ভাতগুলো ব্যারাকে নিয়ে যেতে পারতেন না। বলেন, সবাই যখন খায়, আমিও সেখানে গিয়ে খাবো। একবার আমরা ব্যারাকে ভাত খাবো খাবো এমন অবস্থায় আছি। তখন আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা। হঠাৎ বিজলী চমকায়। সাথে সাথে আমাদের পাশে যে গাছটা ছিলো তাতে বজ্রপাত হলো। এরকম আরও অনেক স্মৃতি আছে, যেগুলো এখানে বলার নয়।

বিশেষ প্রতিবেদন

লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলার চার মাস: ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে এবং হামলাকারীদের বিচারে অগ্রগতি নেই

গত ২ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার তিনটি গ্রামে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার চার মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু এই চার মাসেও ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণসহ পুনর্বাসন কাজ শুরু করা যায়নি। ক্ষতিগ্রস্তরা এখানো যেখানে সেখানে বা খালি জায়গায় ঝুপড়ি তুলে কোনমতে দিন অতিবাহিত করছেন। আর বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ থাকায় অনেক পরিবার অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছেন। অপরদিকে উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িতদের বিশেষ করে প্রধান অভিযুক্ত ও হোতাদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি এবং গ্রেফতারের কোন তৎপরতাও দৃশ্যমান নয়। ফলে ঘটনার যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ায়ও কোন অগ্রগতি নেই।

উল্লেখ্য যে, গত ১ জুন ২০১৭ দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের চার মাইল নামক স্থানে নুরুল ইসলাম নয়ন নামে ভাড়ায় চালিত এক মোটর সাইকেল চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। কে বা কারা তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলে যায়। কিন্তু এরপরই ভিত্তিহীনভাবে পাহাড়িরা নয়নকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ তুলে লংগদুতে উস্কানি দিয়ে সেটেলার বাঙালিদের সংগঠিত ও উত্তেজিত করা হয়। এরপর গত ২ জুন ২০১৭ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলা এবং পার্শ্ববর্তী মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যা পাড়ায় সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন স্থানীয় আওয়ামী লীগ-যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটসহ সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। এ হামলায় সর্বমোট ২১৮টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত এবং ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও লুটপাটের শিকার হয়। তিনটিলা এলাকায় গুণমালা চাকমা নামে ৭৫ বছরের এক অশীতিপর বৃদ্ধ আগুনে পুড়ে মারা যান। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের তালিকা অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। এছাড়া স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ২৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা সামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ অগ্নিসংযোগে পুড়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এখন কোন সরকারি ত্রাণ নেই

ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের হিসাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত বাড়ির তালিকা ২১৮টি হলেও ঘটনার দুই দিন পর সরকারের রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২১২টি পরিবারকে রেশন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১২ জুলাই ২০১৭ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি পরিবারকে নগদ ৬ হাজার টাকা, ২ বান্ডিল ঢেউ টিন, ৩০ কেজি চাল ও ২টি করে কম্বল মাত্র ১৯৬টি পরিবারকে দেয়া হয়। ভাড়াতে পরিবারের যুক্তি

তুলে ১৮ পরিবারকে ত্রাণ প্রদান থেকে বাদ দেন লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পরে আরও ২ পরিবারকে রেশনের আওতায় আনা হলেও বাকি ১৬ পরিবারকে রেশন প্রদান না করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখে উপজেলা প্রশাসন। এতে অন্যান্যরা ত্রাণ গ্রহণ করলেও বাদ পড়া ১৬ পরিবারসহ মোট ৩৪ পরিবার প্রতিবাদ স্বরূপ ত্রাণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। পরে প্রশাসন উক্ত বাদ পড়া ১৬ পরিবারকেও ত্রাণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ অবশিষ্ট ৩৪ পরিবার তাদের ত্রাণ গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার প্রায় চার মাস সময়ের মধ্যে সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ মাত্র ঐ একবারই ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। তবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নগদ ৫০০০ টাকা, ১টি লুঙ্গি, ১টি গামছা, তাতের পিনন-খাদি সেট, মশারী ১টি ও শিশুদের জন্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে পরিবার প্রতি ২৫,০০০ টাকা, ইউএনডিপি থেকে প্রতি পরিবারকে ২৫০ ইউএস ডলার এবং রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি থেকে পরিবার প্রতি ১২,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেয়ার কথা রয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সমন্বয়কারী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণ নিয়ে সরকারের লুকোচুরি

ঘটনার কিছু দিন পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে পুনর্বাসন বাবদ নগদ ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু পরে সরকারের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) আবুল কালাম শামসুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক পত্রে আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১২টি পরিবারের বসতগৃহ (৩ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি সেমিপাকা ঘর, ১টি রান্না ঘর ও ১টি শৌচাগার) ও ৮টি দোকান নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি ঘরের প্রাক্কলিত মূল্য আইটিভ্যাটসহ ৫.২৫ লক্ষ টাকা হিসেবে আইটিভ্যাট ১০% বাদে ৪.৭২ লক্ষ টাকা ধরা হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা সরকার কর্তৃক ঘর নির্মাণের পরিবর্তে নগদ অর্থ দাবি করে আসছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয়ন প্রকল্প বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ শুরু থেকে আপত্তি জানিয়ে আসছে।

কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি উপেক্ষা করে সম্প্রতি ১৭৬টি পরিবারের প্রতি বাড়ি নির্মাণ বাবদ ৫,২৫,০০০ টাকা করে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তহবিলে জমা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রকল্প কমিটির তত্ত্বাবধানে টেন্ডারের মাধ্যমে উক্ত ১৭৬টি বাড়ি নির্মাণ করা হবে জানা গেছে। ডিপিপি অনুসারে দুই লক্ষ টাকার অধিক হলে তা টেণ্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয় বলে সরকারের তরফ থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তরা টেন্ডার ছাড়া প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাড়িগুলি নির্মাণ করে দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। এছাড়া ভাড়াটিয়া দোহাই দিয়ে ২১২ পরিবারের মধ্যে ৩৬টি পরিবারকে এই ঘরনির্মাণ সুবিধা থেকে বাদ দেয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্তরা। অধিকন্তু ১৪ জন দোকান মালিকের ১৯টি দোকান, হেডম্যান এসোসিয়েশনের মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার, জনসংহতি সমিতির অফিস, ইউনিসেফের পাড়া কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়ে এখনো সরকারের তরফ থেকে কোন কিছু জানানো হয়নি। ফলে এ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে আশঙ্কা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার চার মাসেও পুনর্বাসন সুবিধা বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ইতোমধ্যে কোন প্রকার ত্রাণসহায়তা না পাওয়ায় অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। বর্তমানে তিনটিলা হাই স্কুল ও বৌদ্ধ বিহারে স্থাপিত আশ্রয় কেন্দ্রে ১৮ পরিবার রয়েছে। তাদের মধ্যে তিনটিলা হাই স্কুলের ৬ পরিবারকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য অচিরেই আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়তে হবে জানানো হয়েছে। এছাড়া তিনটিলায় ৭ পরিবার, বাত্যা পাড়া ১১ পরিবার ও মানিকজোড়ছড়ায় ৩০/৩৫ পরিবার স্ব স্ব জায়গায় ঝুপড়িতে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। অবশিষ্টরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বা জায়গা-জমিতে অবস্থান করছে।

গ্রেফতারকৃত অধিকাংশই জামিনে বেরিয়ে গেছে

জুম্ম গ্রামে হামলা ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পক্ষ থেকে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে লংগদু থানায় ৪টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এগুলির মধ্যে ৩টি কেবল জিডি হিসেবে গ্রহণ করে গত ১০ জুন ২০১৭ তিনটিলা গ্রামের কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটিই কেবল মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এতে ৯৮ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক ৩০০/৪০০ জন সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে পাহাড়িদের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়। এছাড়া গত ২ জুন ২০১৭ বিকালে লংগদু থানার এসআই দুলাল হোসেন কর্তৃক ১৫ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাতনামা ৩০০ জনের বিরুদ্ধে লংগদু থানায় একটি পুলিশী মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত উভয় মামলায় এ পর্যন্ত ৩৪ জন সেটেলার বাঙালিকে গ্রেফতার করা হলেও ইতোমধ্যে অধিকাংশই জামিনে ছাড়া পেয়েছে বলে জানা গেছে। হামলার মূল হোতাদের গ্রেফতার করা তো দূরের কথা। তার মধ্যে অন্যতম হলো কিশোর চাকমার দায়েরকৃত মামলার ৪নং আসামী এ্যাডভোকেট আবছার আলী প্রকাশ্যে পুলিশের নাকের ডগায় রাঙ্গামাটি জেলা আদালতে ওকালতির কার্যক্রম চালাচ্ছেন, কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করছে না। ফলে এত বড় বর্বরোচিত হামলার ন্যায়বিচার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নৃশংস এই হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার যথাযথ বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকার অভাবই এক্ষেত্রে দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ পর্যন্ত আদিবাসী জুম্মদের উপর ২০ টির মত এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগজনকভাবে এর একটিরও যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা হয়নি। দোষীরাও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করেনি। যার সরকার, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের জন্য চরম লজ্জাজনক। যে কারণে বারবার এধরনের বর্বরোচিত ও মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য, দেশে এ ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকার কারণে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ অবৈধ বসতিস্থাপনকারী সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন না করার কারণে স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও এবং চুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পরেও লংগদু হামলার মত এধরনের পাশবিক হামলা সংঘটিত হয়েছে।

সংবাদ প্রবাহ

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

মানিকছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা নারী গণধর্ষণের শিকার

গত ১২ আগস্ট ২০১৭ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার যুগ্যছোলা ভাঙ্গামুড়া নামক এলাকায় ৩০ বছরের এক ত্রিপুরা নারী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায়, ঘটনার সময় ওই নারী মোবাইল মেরামতের জন্য যোগ্যছোলা বাজারে যান। মোবাইল মেরামতের দোকান বন্ধ থাকায় বাড়িতে ফিরে আসার পথে ভাঙ্গামুড়া নামক স্থানে পৌঁছলে ৮ জন সেটেলার বাঙালি তাঁকে একা পেয়ে মুখে কাপড় বেঁধে জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে ধরে নিয়ে একটি বাগান বাড়িতে আটকে রেখে গণধর্ষণ করে। পরদিন ১৩ আগস্ট সকালে এলাকার লোকজন বাগান বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ওই নারীর চিৎকার শুনে এগিয়ে গেলে ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে ফটিকছড়ির ভুজপুর থানায় দুজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৬ জনের নামে গত ১৩ আগস্ট ২০১৭ মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ এখনও ধর্ষকদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

পানছড়ির পাইয়ং কার্বারী পাড়ায় এক ত্রিপুরা নারীর লাশ উদ্ধার

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মঙ্গলবার রাত ১১ ঘটিকায় পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের পাইয়ং কার্বারী পাড়া থেকে চন্দ্র বিশু ত্রিপুরার স্ত্রী বালাতি ত্রিপুরার (৫৫) গলাকাটা লাশ পাওয়া গেছে। জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যার পরও বাড়িতে না ফেরায় বালাতি ত্রিপুরা স্বামী ও ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে একটি নির্জন এলাকায় গলাকাটা অবস্থায় লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশকে জানালো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। এ ঘটনায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকালে নিহতের স্বামী পানছড়ি থানায় অজ্ঞাতনামা ১১-১২ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। দুপুরে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক চাকমা নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের মধ্য বোয়ালখালী গোপাল মেম্বারপাড়ায় সেটেলার কর্তৃক এক চাকমা নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। জানা যায় যে, ঘটনার সময়ে মৃত সরতি চাকমার স্ত্রী ইন্দ্রা দেবী চাকমা (৫০) গরুর জন্য জমিতে ঘাস সংগ্রহ করতে যান। এ সময় সেটেলার মো: আলাউদ্দিন (৬৫) ইন্দ্রা দেবী চাকমাকে বাধা দেয়। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে মো: আলাউদ্দিন ধারালো ছুরি দিয়ে ইন্দ্রা দেবী চাকমাকে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন খুনি সেটেলার মো: আলাউদ্দিনকে ছুরিসহ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণ

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ দুপুর প্রায় ১২টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার অযোধ্যা মৌজার অযোধ্যা বাজারের মোঃ লেলু মিয়া (৫০) নামে এক সেটেলার বাঙালি ১৭ বছরের এক ত্রিপুরা শিকোরীকে ধর্ষণ করে। জানা যায় যে, ঘটনার দিন প্রতিদিনের মতো ধর্ষিতার মাতা-পিতা দিন মজুরের কাজে যায়। আর ধর্ষিতা তার ৫/৭ বছরের ভাই-বোনদের নিয়ে বাড়িতে ছিল। তাদের বাড়ি কিছুটা জঙ্গল এলাকায় হওয়ায় সেই সুযোগকে ধর্ষক কাজে লাগায়। মো: লেলু মিয়া ধর্ষিতার বাড়িতে হঠাৎ ঢুকে ঝাপটে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। বিকালে ধর্ষিতার বাবা-মা বাড়িতে ফিরলে মেয়েটা ঘটনার বিষয়টি জানায়। তার বাবা স্থানীয় অযোধ্যা বাজার বিওপি ক্যাম্প কমান্ডারের কাছে বিচার চাইলে তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ আলী মিয়ার কাছে যেতে বলেন। এরপর ধর্ষিতার বাবা মেম্বারের কাছে বিচার চাইলে তিনি আজ করবো, কাল করবো বলে কাল ক্ষেপণ করছেন।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারধর

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বিকাল ৩:২০ ঘটিকার সময় মাটিরাঙ্গা সদরে টিএন্ডটি সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারের অনুষ্ঠান শেষে বিনয় রক্ষিত ভিক্ষু মাটিরাঙ্গা বাজার হতে বেলছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব খেদাছড়া আদর্শ বৌদ্ধ বিহারের উদ্দেশ্যে মোঃ ইউসুফ নামে এক পরিচিত মোটর বাইক চালকের মোটর বাইক ভাড়া করে যাচ্ছিলেন। এসময় আগে থেকে ওঁৎপেতে থাকা ৮/১০ জন সেটেলার বাঙালি বেলছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হাতিপাড়া বনানী পুকুর কাছাকাছি পৌছামাত্র মোটর বাইক আটকায় এবং 'মিয়ানমারে বৌদ্ধরা মুসলিম হত্যা করছে, আমরাও বৌদ্ধদেরকে ছাড়বো না' বলে বিনয় রক্ষিত ভিক্ষুকে মারধর করতে করতে টেনে হেঁচড়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত করে। ঘটনাস্থলে বৌদ্ধ ভিক্ষু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করলে পরক্ষণে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এ সময় গাড়ীর

যাত্রী এবং মোটর বাইক চালকের সহযোগিতায় ভিক্ষুকে মাটিরাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কের চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন মাজার শরীফ গেইটের সংলগ্ন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হামলার চেষ্টা করা হয়, পুলিশের সহায়তায় তিনি রক্ষা পান।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে সেটেলার মুসলিম বাঙালিরা সেকান্দ ত্রিপুরা (৪২) ও কর্ণেল চাকমা (১৮) নামে দু'জন নিরীহ পথচারী জুম্মকে মারধর করেছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পাইথুই চাক (৪৭) নামে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী হেডম্যান পাড়ার এক জুম্ম অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। তিনি সেদিন সকালে পাহাড়ে গরু চড়াতে গেলে আর ফিরে আসেননি। তার পরদিন জনৈক মো: জাফরের বাগানে তার লাশ পাওয়া যায়। রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গীরা মেরে ফেলতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দু'জন জুম্মকে মারধর

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে দু'জন নিরীহ পথচারী জুম্মকে সেটেলার বাঙালিরা মারধর করেছে।

জানা যায়, ঘটনার সময়ে পূর্ব খেদাছড়া চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা কমলাধন ত্রিপুরার ছেলে সেকান্দ ত্রিপুরা (৪২) বাজার করতে মাটিরাঙ্গা বাজারে এলে সেটেলার বাঙালিরা মিছিল থেকে তাকে ধরে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকে। পরে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। ওই সময়ে মাটিরাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরিক্ষার্থী রবি সুন্দর কার্বারী পাড়ার অংশুমনি চাকমার ছেলে কর্ণেল চাকমা (১৮) কলেজে আসার পথে মাটিরাঙ্গা বাজারে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলার শিকার হয়। আহতদের জখম গুরুতর না হওয়ায় বাড়িতে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে সন্দেহভাজন রোহিঙ্গা জঙ্গী কর্তৃক এক চাক গ্রামবাসীকে হত্যা

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী হেডম্যান চাক পাড়ার বাসিন্দা পাইথুই চাক (৪৭) জঙ্গলে গরু চড়াতে গেলে নিখোঁজ হয়ে যায়। গ্রামের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা খোঁজতে গিয়ে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৭:০০ টার দিকে জাফরের বাগানে পাইথুই চাকের লাশ উদ্ধার করে। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের ধারণা হচ্ছে, সশস্ত্র রোহিঙ্গা জঙ্গীরা পাইথুই চাককে হত্যা করতে পারে। এসব এলাকায় সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের আস্তানা থাকায় জঙ্গীরা স্থানীয় অধিবাসীদের জঙ্গলে ঢুকতে দেয় না। এর আগেও ২০ মে ২০১৬ ছড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে মংহ্লাসিং মারমা (৪৫), থুইহ্লামং মারমা (২২) ও ক্যসিং থোয়াই মারমা (২২) নামে তিনজন মারমা গ্রামবাসী আর ফিরে আসেনি। তাদের লাশও পাওয়া যায়নি। তাদেরকে রোহিঙ্গা জঙ্গীরা হত্যা করেছে বলে এলাকাবাসী দাবি। তারও আগে ১৪ মে ২০১৫ বাইশারী ইউনিয়নের উপর চাক পাড়ায় রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা ৭৩-বছরের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করে।

বরকলের আইমাছড়া ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জায়গা জবরদখল

সম্প্রতি অক্টোবর মাসে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন আইমাছড়া ইউনিয়নের গর্জনতলী মৌজার ধন্ধছড়া ও রামোছড়া এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভোগদখলীয় জায়গা-জমি জবরদখলের খবর পাওয়া গেছে। জুম্মদের বাধা সত্ত্বেও সেটেলার বাঙালিরা জায়গা দখল করে ৫/৬টি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছে বলে জানা গেছে। যেমন- আইমাছড়া ইউনিয়নের কলাবন্যা থেকে মো: তমীর আলী নামে জনৈক সেটেলার বাঙালি রামোছড়া গ্রামের জ্ঞান কুমার চাকমা পিতা ইন্দ্র মুনি চাকমার টিলাভূমি দখলের উদ্দেশ্যে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৭ জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। এতে জ্ঞান কুমার চাকমা বেদখলরত তমীর আলীকে বাধা দিলে আরো কয়েকজন সেটেলার বাঙালি এনে জঙ্গল কাটার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। জানা গেছে যে, শাহ আলম কর্তৃক শুক্র কুমার চাকমা পিতা সন্ধ্যা চাকমার দুই একর টিলাজমি, মো: হানিফ কর্তৃক পূর্ণ মোহন চাকমা পিতা মনচন্দ্র চাকমার দুই একর জায়গা, মো: তমীর আলী কর্তৃক কিনারাম চাকমা পিতা নবীন চাকমার দুই একর জায়গা, মান্নান মুন্সী কর্তৃক দয়া মোহন চাকমা পিতা মনচন্দ্র চাকমার দুই একর টিলা জমি এবং মোহাম্মদ আজিজুল হক কর্তৃক কান্যারাম চাকমা পিতা লক্ষণ্যা চাকমার দুই একর টিলাজমি জবরদখল করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছে। এতে করে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

শ্রীনগরে ভূমি মালিকের সম্মতি ব্যতীত লোকালয়ের মধ্যে বিজিবি'র বিওপি স্থাপনের উদ্যোগ

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ৫নং বড়হরিণা ইউনিয়ন ও ১৬১নং বামের মহালছড়ি মৌজার অন্তর্গত শ্রীনগর এলাকায় চিত্র কুমার চাকমা নামে এক জুম্ম গ্রামবাসীর রেকর্ডকৃত ৪.০ একর ভূমি জবরদখল করে লংগদু উপজেলাধীন রাজানগর বিজিবি জোন (৩৭ ব্যাটেলিয়ন) একটি বিওপি স্থাপনের উদ্যোগে নিয়েছে। বিজিবি থেকে বলা হচ্ছে যে, উক্ত জায়গার উপর বিওপি স্থাপনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাদের অনুমতি রয়েছে। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উক্ত অনুমতিপত্র বিজিবি কর্তৃপক্ষ ভূমি মালিককে দেয়নি বা প্রদর্শন করেনি। ভূমি মালিকসহ এলাকাবাসীর অজান্তে ও সম্মতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক ভূমি দখল করে বিওপি স্থাপনের উদ্যোগের ফলে জুম্ম এলাকাবাসী চরম উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ৫নং বড় হরিণা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে এবং ১৬১নং বামের মহালছড়ি মৌজার জ্ঞানশ্রী কার্বারী পাড়ায় হোল্ডিং নং-আর-২৮ মূলে ৫.০ একর জায়গা চিত্র কুমার চাকমা (৮৫), পিতা রাম কিঙ্কর চাকমার নামে জমাবন্দীতে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। কাপ্তাই বাঁধে উদ্বাস্তু হওয়ার পর ১৯৬৭ সালে বি ফর্ম মূলে তিনি উক্ত জমি বন্দোবস্তী লাভ করেছিলেন। এলাকার শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধহয়ে উক্ত ৫.০ একর জায়গা থেকে ১.০ একর জায়গা বামের মহালছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। বাকি ৪.০ একর জায়গার চৌহদ্দি হচ্ছে উত্তরে ছড়া ও মালছড়ি, দক্ষিণে স্কুল ও ছড়া, পূর্বে ঝিরি এবং পশ্চিমে টিলা ও ঝিরি। চিত্র কুমার চাকমার উক্ত জমি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ৪০০-৫০০ গজের মধ্যে অবস্থিত।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত জায়গায় চিত্র কুমার চাকমা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ফলজ বাগান সৃষ্টি করে বসবাস করে আসছেন। উক্ত জায়গায় ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বর্তমানে ৬ পরিবার বসবাস করছে। উক্ত জায়গার সংলগ্ন স্থানে বসবাস রয়েছে আরো ১১ পরিবার। উক্ত জায়গার পার্শ্বে রয়েছে দোকানঘাট (শ্রীনগর), মারিশ্যাছড়া (হেডম্যান পাড়া) ও মালছড়ি নামক তিনটি জুম্ম গ্রামের প্রায় ১৭০ পরিবার। উক্ত জায়গার লাগোয়া একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেটি চিত্র কুমার চাকমার দানকৃত জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। নিকটবর্তী স্থানে রয়েছে শ্রীনগর বাজার ও একটি বৌদ্ধ বিহার। জনবসতির মধ্যে অবস্থিত উক্ত জায়গায় বিজিবি'র বিওপি স্থাপিত হলে উক্ত জায়গায় ও পার্শ্ববর্তী জায়গায় বসবাসরত ১৮ পরিবার উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। উক্ত জায়গায় লাগোয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর সরাসরি প্রভাব পড়বে। তিনটি জুম্ম গ্রামের প্রায় ১৭০ পরিবারের উপর মারাত্মক সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় ৫নং বড়হরিণা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ১৬১নং বামের মহালছড়ি মৌজার হেডম্যানসহ এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে উক্ত জায়গা থেকে অনতি দূরে একটি বিকল্প জায়গায় উক্ত বিওপি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত বিকল্প জায়গাটি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ৩০০-৪০০ গজের মধ্যে অবস্থিত।

উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থানে বিজিবি'র বিওপি স্থাপনের খবর জানাজানি হলে উক্ত জমি হুকুম দখল থেকে অবমুক্ত রাখার আবেদন জানিয়ে ১৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসকের বরাবরে ৬৬ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দরখাস্ত প্রদান করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, চাকমা সার্কেল চীফ, রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ সুপার, বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বরকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রমুখদেরকে অনুলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত জায়গায় বিজিবি'র বিওপি স্থাপিত হলে দোকানঘাট এলাকায় সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা হবে বলে উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়।

উক্ত জমি হুকুম দখলকল্পে রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন তদন্তের পর গত ১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ভূমি মালিক চিত্র কুমার চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসকের বরাবরে উক্ত জমি হুকুম দখল থেকে অবমুক্ত রাখার আবেদন জানিয়ে এলাকার ৬৬ জনের দস্তখতসহ একটি দরখাস্ত প্রদান করেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, বিজিবি মহাপরিচালক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রমুখদেরকে অনুলিপি প্রদান করেন। উক্ত দরখাস্তের পর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে ভূমি মালিক চিত্র কুমার চাকমা আবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসকের বরাবরে আরেকটি দরখাস্ত প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, চিত্র কুমার চাকমার জমিতে বিওপি স্থাপন না করে গ্রাম থেকে সামান্য দূরে আরেকটি জায়গায় বিওপি স্থাপনের আবেদন জানান বড়হরিণা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ এলাকাবাসী। কিন্তু চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডীয় জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও বিজিবি সদস্যরা বিওপি স্থাপনে রাজী নয়। বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, উক্ত জায়গার উপর বিওপি স্থাপনের জন্য তাদের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি এসেছে। স্থানীয় হেডম্যানেরও সুপারিশ রয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। সুতরাং তাদের করার কিছু নেই। তবে উক্ত জমির উপর বিওপি স্থাপনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে বিজিবি দাবি করে আসছেন, সে সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র ভূমি মালিককে দেননি বিজিবি।

সর্বশেষ গত ৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৩৭ বিজিবি লংগদু উপজেলাধীন রাজানগর জোনের আওতাধীন গাছকাটাছড়া বিজিবি ক্যাম্প, দেবাছড়ি বিজিবি ক্যাম্প ও বোধিপাড়া বিজিবি ক্যাম্প থেকে সর্বমোট ৩৬ জন বিজিবি সদস্য চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডকৃত উক্ত জায়গায় তাম্বুল টাঙিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। গাছকাটাছড়া

বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার মোঃ শুকর আলী ও বোধিপাড়ার ক্যাম্প সুবেদার মোঃ জলিলের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা সেখানে অবস্থান নেন।

তৎপ্রেক্ষিতে গত ৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৫নং বড়হরিণা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিলাময় চাকমা জোরপূর্বক অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় বিওপি নির্মাণ না করার আবেদন জানিয়ে বিজিবি মহাপরিচালকের বরাবরে এক দরখাস্ত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে গত ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ১৬১নং বামের মহালছড়ি মৌজার হেডম্যান ধন লাল চাকমাও জোরপূর্বক অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় বিওপি নির্মাণ না করে পার্শ্ববর্তী আরেকটি জায়গায় নির্মাণের আবেদন জানিয়ে বিজিবি মহাপরিচালকের বরাবরে এক দরখাস্ত প্রদান করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সাংসদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকেও দরখাস্তের অনুলিপি প্রদান করেন হেডম্যান ধন লাল চাকমা। চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডকৃত উক্ত জমির উপর বিওপি স্থাপনের জন্য কোন সুপারিশ করেননি বলে তিনি উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করেন।

গত ১৩ আগস্ট ২০১৭ ক্যাম্প নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করা হবে মর্মে ঘোষণা করে উদ্বোধনের সময় ৫নং বড়হরিণা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, ১৬১নং বামের মহালছড়ি মৌজার হেডম্যানসহ এলাকাবাসীদেরকে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেন বিজিবি কর্তৃপক্ষ। সেদিন ১৩ আগস্ট বিওপি স্থাপনের কাজ উদ্বোধন করতে রাঙ্গামাটি সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল আকরাম পারভেজ, রাজানগর জোনের ভারপ্রাপ্ত জোন কমান্ডার ক্যাপ্টেন কামরুজ্জামান ও মেডিকেল অফিসার মামুন উক্ত এলাকায় উপস্থিত হন। এ সময় এলাকাবাসী উপস্থিত হয়ে ভূমি মালিকসহ এলাকাবাসীর সম্মতি ব্যতিরেকে জোরপূর্বক দখল করে বিওপি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এমতাবস্থায় দুপুর ১:০০ টার দিকে এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় কালে রাঙ্গামাটি সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আকরাম পারভেজ বলেন, স্থানীয় লোকের অমতে কোন জমির উপর বিওপি স্থাপন করা হবে না। তবে উক্ত এলাকায় বিওপি করা হবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন। এলাকাবাসীর প্রতিবাদের কারণে বিওপি স্থাপনের কাজ তিনি তিন মাসের জন্য সাময়িক স্থগিত ঘোষণা করে বিজিবি সদস্যদের নিয়ে সেখান থেকে চলে যান। সেদিন বিওপি উদ্বোধনের কাজ স্থগিত করা হলেও রাঙ্গামাটি সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আকরাম পারভেজ চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডীয় উক্ত জায়গায় বিওপি স্থাপনের উদ্যোগ বাতিল করেননি বা প্রস্তাবিত বিকল্প জায়গায় বিওপি স্থাপন করার কথাও ঘোষণা করেননি। তাই ভূমি মালিকসহ এলাকাবাসী চরম উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডীয় ৪.০ একর জায়গায় বসবাসরত ৬ পরিবার-

১. বব্রু বাহন চাকমা, পিতা গুণধর চাকমা
২. নিবারন চাকমা, পিতা হরিমোহন চাকমা
৩. মারকোস চাকমা, পিতা চন্দ্র লাল চাকমা
৪. বিপিন চন্দ্র চাকমা, পিতা মধুমঙ্গল চাকমা
৫. শান্তিময় চাকমা, পিতা রাঙ্গাচান চাকমা
৬. নিরতা চাকমা, পিতা সুর্যসেন চাকমা।

চিত্র কুমার চাকমার নামে রেকর্ডীয় জায়গার পাশে বসবাসরত ১১ পরিবার-

১. সুশীল চাকমা, পিতা নতুন চন্দ্র চাকমা
২. কালাধন চাকমা, পিতা সমমণি চাকমা
৩. অমলেন্দু চাকমা, পিতা সমমণি চাকমা
৪. বীরেন্দ্র চাকমা, পিতা কিনামণি চাকমা
৫. ভরত চাকমা, পিতা থেমখুলা চাকমা
৬. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, পিতা সুরেন্দ্র চাকমা
৭. গোবিন্দ চাকমা, পিতা শশী কুমার চাকমা
৮. জ্যোতিময় চাকমা, পিতা ললিত কুমার চাকমা
৯. ললিত কুমার চাকমা, পিতা ময়ন্দর চাকমা
১০. মায়া শংকর চাকমা, পিতা সুন্দ্র কুমার চাকমা
১১. জ্ঞানশ্রী কার্বারী, পিতা ইন্দ্র কুমার চাকমা।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ লংগদু বিজিবি বদিপাড়া ক্যাম্পের একদল বিজিবি সদস্য হাড়ি-পাতিল ও খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে শ্রীনগরে বিতর্কিত জায়গায় গিয়ে অবস্থান করে। তারপর দিন লংগদু জোন কম্যান্ডার লেঃ জেঃ বশির আহমেদ মোল্লাও শ্রীনগরে যান। সেসময় এলাকাবাসী

বিজিবির বিওপি স্থাপনের বিকল্প জায়গা পরিদর্শনের জন্য জোন কম্যান্ডারকে অনুরোধ করলে তিনি প্রস্তাবিত জায়গাটি দেখতে যান। জায়গাটি পরিদর্শন করে তিনি বলেন, রাঙ্গামাটি সেক্টর কম্যান্ডারের যদি জায়গাটি পছন্দ হয় তাহলে তারও পছন্দ হবে। এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক যুব সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদকের বাড়ি ঘেরাও ও তল্লাসী

গত ২৪ আগস্ট ২০১৭ দুপুর ১২ ঘটিকার সময় জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া জোনের মেজর মোরশেদ-এর নেতৃত্বে একদল সেনা জুরাছড়ি উপজেলার চকপুদিঘাট গ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মণিষ তালুকদারের বাড়ি তল্লাশি চালায়। বাড়ি তাঁকে না পেয়ে তারপরে মেজর মোরশেদ স্থানীয় ইউপি মেম্বার রনঞ্জয় চাকমাকে ফোন করে জানিয়ে দেন যে, ২৫ আগস্ট সকাল ১০ ঘটিকার সময় মণিষ তালুকদার যাতে জোনে গিয়ে দেখা করতে যান। উক্ত মেম্বারের কথামত তিন মেম্বার (১) রনঞ্জয় চাকমা (২) সুশান্ত কার্বারী (৩) অসিত বরণ চাকমাসহ জোনে দেখা করতে যান। তারপর তিন মেম্বারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তাদেরকে ক্যাম্পের প্রথম গেইটে যেতে বলা হয়। পরে মণিষ তালুকদারের সাথে কথা বললেন মেজর গোলাম মোর্তুজা এবং মেজর মোরশেদ। শুরুতে তারা মণিষকে বলেন যে, মণিষ যদি সোজা কথায় যদি কথা বলেন তাহলে তাকে 'আপনা আপনি'ভাবে কথা বলবেন আর যদি না বলেন তাহলে 'তুমি'তে চলে যাবেন। এরপর গোলাম মোর্তুজা মণিষের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, চিক্কা, বুজ্জে, গাজি চাকমারা কোথায় থাকেন? এদের তিন জনের ছবি দুদিনের মধ্যে দিতে হবে এবং তিনজনকে ধরিয়ে দিতে

হবে। তাদের কথামত কাজের কাজ করতে না পারলে বিবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুমকি দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল কাজ প্রতিহত করা হবে বলে সেনা কম্যান্ডাররা জানান। এরপর বনযোগীছড়া জোন থেকে মণিষ তালুকদারকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সভা-সমিতি ও চলাচলে সেনাবাহিনীর বাঁধা, হয়রানি ও তল্লাসী

সাম্প্রতিক কালে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার নৌপথ সংলগ্ন গাছকাবা ছড়া সেনাক্যাম্পে চুক্তির পূর্ব বা সামরিক শাসনামলের মতই যাতায়াতকারীদের হাজিরা, তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জুরাছড়িতে খোদ উপজেলা সদরে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনের সভা-সমাবেশ বা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় সভা হলে তাতে সেনাসদস্যরা অনধিকার প্রবেশ করছেন এবং কোন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি না হয়েও বিনাঅনুমতিতে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছেন। এছাড়া সাম্প্রতিক কালে জুরাছড়ির নৌপথে ভিজেকিজিং সেনাক্যাম্পে চুক্তির পূর্বাবস্থার মতই নির্বিচারে যাতায়াতকারীদের তল্লাশী, জিজ্ঞাসাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জুরাছড়িতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির উদ্যোগে সমিতির উপজেলা কমিটির সহ-সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান উদয়জয় চাকমার সভাপতিত্বে এবং জনসংহতি সমিতি ও মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় ইউনিফরম পরিহিত দুই জন সেনাসদস্য বিনা অনুমতিতে অনুষ্ঠালস্থলে প্রবেশ করে অনুষ্ঠানের ছবি তোলে এবং সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সভাস্থলের বাইরে অবস্থান করে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার দুরছড়ি বাজারে দুরছড়ি সেনাক্যাম্পের সেনাসদস্যরা দুরছড়ি বাজারে যাতায়াতকারী জুম্মদের নিকট হতে আইডি কার্ড দেখতে চায় এবং যারা আইডি কার্ড দেখাতে পারেনি তারা বাজারে কোন কিছু কিনতে যেতে পারেনি। এতে তাৎক্ষণিকভাবে এলাকাবাসীর চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। বস্তুত এভাবে সেনাবাহিনী যে কোন সময় যে কোন নিয়ম জারি করে জুম্ম জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি করে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাত ১০ টায় একদল পুলিশ জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা অফিসে গিয়ে অফিসে কে কে থাকে এবং অফিসে মিটিং হয় কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ভোর ৩:০০ ঘটিকায় জুরাছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের অন্তর্গত বেদোল্যা এলাকায় চিগোন চাকমার পুত্র জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (২৮) এর বাড়ি ঘেরাও করে। পরিবারের সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সেনা সদস্যরা অভিযোগ করে যে, জ্ঞান রঞ্জন চাকমার বাড়িতে একটি অস্ত্র আছে এবং তা দেখিয়ে দিতে চাপ দেয়। তার কাছে কোন অস্ত্র নেই বলে জ্ঞান রঞ্জন চাকমা উত্তর দিলে একপর্যায়ে তল্লাসীর ভান করে ইজোর থেকে একটি গাদা বন্দুক এবং উলুন থেকে কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা করে। এরপর জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে রাতে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু কোন না কোনভাবে বাঁধন খুলে রাত্রে জ্ঞান রঞ্জন চাকমা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়। জ্ঞান রঞ্জন চাকমা একজন নিরীহ লোক, গরীব জুমচাষী। তিনি একজন মৃগী রোগী। তার স্ত্রীও একজন প্রতিবন্ধী (খোঁড়া)।

আটককৃত জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে হারানোর পর জুরাছড়ি সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার এ কে এম ওবায়েদুর হক জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সভাপতি মায়াচান চাকমাকে অনুরোধ করেন, জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে খোঁজ করে ক্যাম্পে তাঁর কাছে যেন নিয়ে আসেন। জোন কম্যান্ডার জানান যে, তারা জেনেছেন যে জ্ঞান রঞ্জন চাকমা নিরীহ লোক ও মৃগী রোগী, তার স্ত্রীও প্রতিবন্ধী। তাদের ভুল হয়ে গেছে। জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে পেলে তাহলে তিনি (জোন কম্যারন্ডার) হাতে হাতে জ্ঞান রঞ্জন চাকমার স্ত্রীর হাতে বুঝিয়ে দিতে চান। জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে কিছুই করা হবে না। থানায় যে জিডি হয়েছে তাও প্রত্যাহার করা হবে বলে জোন কম্যান্ডার জানান। তদনুসারে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জ্ঞান রঞ্জন চাকমা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ক্যাম্পে হাজির হন। ৫,০০০ টাকা দিয়ে জোন কম্যান্ডার তাঁকে তার স্ত্রীর কাছে বুঝিয়ে দেন।

ক্যবামং মারমাকে উপজেলা পরিষদের সভায় যোগাদানে বাধা

সাজানো অপহরণ মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপাসারণের নির্দেশ হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ করার পর গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ক্যবামং মারমা রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের সভায় যোগ দিতে রোয়াংছড়িতে যান। কিন্তু তার আগের রাতে (১৪ সেপ্টেম্বর) রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা রোয়াংছড়িস্থ ক্যবামং মারমার বাড়ির দিকে টহল দিয়ে আসে। ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে উপজেলা পরিষদের সভায় যোগ দিতে গেলে এ সময় রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে একদল সেনা রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে যায়। তখন রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মা উ সিং মারমাকে ডেকে উক্ত মেজর বলেন যে, চেয়ারম্যান হিসেবে ক্যবামং মারমার যোগ দেয়ার জন্য উপর থেকে নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত তাঁর রোয়াংছড়িতে থাকা ঠিক হবে না। এখান থেকে সরে গিয়ে তাঁকে নিরাপদ স্থানে থাকতে ক্যবামং মারমাকে বলার জন্য উক্ত মেজর মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে জানিয়ে যান।

পিসিপি রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তিকৃত নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও আয়োজনের চূড়ান্ত মুহূর্তে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগের দিন সন্ধ্যার দিকে 'মানববন্ধনের অনুমতি দেয়া হবে না' বলে জানিয়ে দেয়া হয়। এটা বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে পিসিপি প্রতিবাদ করেছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে জুম ক্ষেত নষ্ট করে হেলিপ্যাড ও ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের বাইসাং ত্রিপুরা পাড়ায় কেরাপুত ত্রিপুরা পীং বালান্ত ত্রিপুরার জুমের উপর একটি হেলিপ্যাড ও ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শুরু করে কক্সবাজার জেলার রামু সেনানিবাসের একদল সেনা সদস্য। সেনা সদস্যরা কেরাপুত ত্রিপুরার জুম ঘরের খুঁটি কেটে অন্যত্র নিয়ে রাখে। জুমে ক্ষেতের বড় বড় গাছগুলি কেটে ফেলে। এতে প্রচুর আধা পাকা জুমের ধান নষ্ট হয়ে যায়।

নাইক্ষ্যংছড়ির ছাগলখাইয়া বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃক জুম্মদের মালামাল বহনে বাধা

গত আগস্ট মাস ধরে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়ন অন্তর্গত ছাগলখাইয়া বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা বাকখালী খাল দিয়ে নৌকা যোগে বাজার থেকে তুরগু মৌজা, কামিছড়া মৌজা, কোয়াইংঝিড়ি মৌজা, ক্রোক্ষং মৌজা ও বাকখালী মৌজার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুম্মরা সাপ্তাহিক বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নেয়ার সময় হয়রানিমূলক তল্লাসী করে। কেন এত চাল, তরকারি, শুকটিসহ মালামাল নেয়া হচ্ছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে। সন্ত্রাসীদের জন্য নেয়া হচ্ছে কিনা এ রকম অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করে। প্রত্যেক পরিবারে কতজন সদস্য আছে তার হিসাব দিতে জুম্মদেরকে বাধ্য করে। অথচ একই নৌপথ দিয়ে রোহিঙ্গা জঙ্গী সংগঠন আরএসও-এর জন্য প্রচুর মালামাল নিলেও বিজিবি সদস্যরা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে।

পিসিপি বান্দরবান জেলা সম্মেলন সেনাবাহিনীর ভন্ডুল করার চেষ্টা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বান্দরবান সেনা জোনের একদল সেনা বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ফারুখপাড়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল ভন্ডুল করার চেষ্টা করে। সম্মেলন শুরু হলে সকালে একদল সেনা সদস্য সম্মেলনস্থলে গিয়ে ব্রিগেড থেকে অনুমতি নেয়া হয়েছে কিনা পিসিপি সদস্যদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বান্দরবান জেলা প্রশাসক থেকে অনুমতি নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে পিসিপি সদস্যরা সেনা সদস্যদের অবহিত করে। সেনা ব্রিগেড থেকে কেন অনুমতি নেয়া হয়নি এটা নিয়ে সেনা সদস্যরা অনেকক্ষণ ধরে পিসিপি সদস্যদের হয়রানি করার চেষ্টা করে। পরে পিসিপি সম্মেলন করতে দিলেও সম্মেলন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেনা সদস্যরা সম্মেলন কক্ষের বাইরে অবস্থান করে।

লামায় সেনাবাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে দুই পিসিপি কর্মী আটক ও মারধর

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বিকাল আনুমানিক ২:৩০ ঘটিকায় বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন লামা উপজেলার লামা বাজারের একতা অফিস থেকে সাদা পোশাক পরিহিত একদল সেনাসদস্য কোন অভিযোগ বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই বেআইনীভাবে উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর গজালিয়া ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ক্যশৈ মারমা (২৫) ও সাধারণ সম্পাদক খিংমংঞোয়াই মারমাকে (২৪) আটক করে। আটক করার সাথে সাথে চোখ বেঁধে দেয় এবং কিছুক্ষণ পর চম্পাতলী ক্যাম্প থেকে একটি গাড়ি এনে গাড়িতে করে চম্পাতলী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। গাড়িতে তোলার সময় সাদা পোশাকধারী সেনাসদস্যরা ছাত্রদের শারীরিকভাবেও আঘাত করে। চম্পাতলী ক্যাম্পে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাখে। সেখানে সেনা সদস্যরা পিসিপি কর্মীদের অমানুষিকভাবে মারধর করে। অস্ত্র কোথায় আছে, সন্ত্রাসীরা কোথায় থাকে, কোন কোন সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে তাদেরকে মারধর করা হয়। এরপর আলিকদম সেনা জোনে নিয়ে যায়। সেখানেও আলিকদম জোনের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডার কর্তৃক একই ধরনের প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আটক হওয়ার সময় ঐ দুই পিসিপি কর্মী বৌদ্ধদের আসন্ন প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে লামা বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এসেছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় যে, আটককৃত দুই ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে কোন মামলা যেমনি ছিল না, তেমনি আটকের সময় সেনাসদস্যদের হাতে কোন ওয়ারেন্টও ছিল না। ফলে সেনাবাহিনী কর্তৃক এই আটক একতরফা ও বেআইনী কাজ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জানা গেছে, রাত ১:০০ ঘটিকার দিকে (১ অক্টোবর) উক্ত দুই পিসিপি কর্মীকে আলিকদম সেনা জোন থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর্মীরা ধরে নিয়েছে এবং মারধর করেছে এই কথা কাউকে বলা যাবে না বলে সেনা কর্তৃপক্ষ পিসিপি কর্মীদেরকে নির্দেশ দেয়।

জুরাছড়িতে পিস্তল গুঁজে দিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিনজন জুম্ম জেলের ছবি তোলা

গত ৯ অক্টোবর ২০১৭ রাতে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের একদল সেনা পিস্তল গুঁজে দিয়ে তিনজন জুম্ম জেলের ছবি তুলে নিয়েছে বলে জানা গেছে। জানা যায় যে, সেদিন রাতে রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন চেগেয়াছড়ি গ্রামে কাপ্তাই হ্রদে জগৎ চন্দ্র চাকমা (২৯) সহ তিনজন জুম্ম জেলে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন। এ সময় রাত ৮:০০ টা দিকে লোকের চলাচলের শব্দ শুনে তারা টর্চের আলো ফেললে একদল সেনা সদস্যকে দেখেন। টর্চের আলো ফেলায় সেনা সদস্যরা জুম্ম জেলেদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিন জুম্ম জেলেকে জড়ো করে একটি পিস্তল গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে এবং তারপর দিন ক্যাম্পে হাজির হতে জুম্ম জেলেদেরকে নির্দেশ দিয়ে চলে যায়।

সংগঠন সংবাদ

লংগদু অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণী অনুষ্ঠান

লংগদুর শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ সর্বহারা, কুচক্রীরা এখনও অধরাই- উষাতন তালুকদার এমপি

গত ১ আগষ্ট ২০১৭ মঙ্গলবার লংগদু অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ২৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলেজ পর্যায়ে প্রতিজনকে ৪ হাজার টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ২ হাজার করে সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি ছিলেন লংগদু সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবি রঞ্জন চাকমা, লংগদু সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃষক কুমার চাকমা, ১নং আটরকছড়া ইউপি চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমা। এছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার বলেন, লংগদু উপজেলার সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ কুচক্রীদের বলির শিকার হয়েছেন। মোটর সাইকেল চালক নয়নকে কে বা কারা হত্যা করেছে তার বিচার আমরা সবাই চাই। এমন হত্যাকাণ্ডে আমরা সবাই দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু দোষীদের বিচার না করে আরও একটি বড় রকমের ঘটনা করা হলো যা বিবেকবান কোন মানুষ মেনে নিতে পারে না। নয়নকে হত্যা করা হলো তাতে সাধারণ মানুষের কোন হাত ছিল না। লংগদুর জুম্মরা নয়নকে খুব ভালোবাসতো এতা সবাই জানে। আসলে একটি প্রভাবশালী মহল এসব নাটক করছে। কারণ এমন ঘটনা করতে পারলে তাদের লাভ হয়। চারদিকে বন্যা, ভূমিধস হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় আগুন দিয়ে সম্পদ নষ্ট করাই হলো দেশকে পিছনে টেনে নেয়া। একটি জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করা। এটা মেনে নেওয়া যায় না। নয়ননের বিচার চাইতে গিয়ে পেট্রোল, কেরোচিন নিয়ে মিছিলে আসতে হয় না। এমন ঘটনা যাতে না হয় সবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান যাতে করে দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

তিনি অগ্নিসংযোগের ঘটনার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কয়েকদিন পর জেএসসি, পিএসসি এবং স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা হবে। বইপত্র পুড়ে গেছে বলে মন ভেঙ্গে ফেললে হবে না। মনকে শক্ত করে ভবিষ্যত চিন্তা করতে হবে। ছাত্ররা যাতে ভালো করে লেখাপড়া করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অভিবাবকদের অনুরোধ জানান উষাতন তালুকদার এমপি।

আদিবাসী দিবসে পিসিপি ও আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগরে মানববন্ধন

জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের এক দশক : বিশ্ব আদিবাসী দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগর ও আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে গত ৭ আগস্ট ২০১৭ এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক দীপন চাকমার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ মুন্ডা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মং কে ওয়ান রাখাইন, ছাত্র ফেডারেশন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাজবীরুল ইসলাম কিঞ্জল, ছাত্র ইউনিয়ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ. এম. শাখিল, সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পদক আব্দুল মজিদ অন্তর, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রির সাধারণ সম্পাদক দীলিপ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি দীপেন চাকমা প্রমুখ। মানববন্ধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নকুল পাহান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব আদিবাসী দিবস বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটি পালিত হলেও বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকার তা অদ্যাবধি পালন করে না। সাংবিধানিক স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে আদিবাসী সম্প্রদায় আজ এই শোষণ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে উল্লেখ করে বক্তারা অতি দ্রুত সাংবিধান সংশোধন করে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, সংশোধিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের তহবিল গঠন, জনবল নিয়োগ ও যথাস্থানে কার্যালয় স্থাপনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানান এবং সমতল আদিবাসীদের জন্য পৃথক ও স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সম্পন্ন

গত ২২ আগস্ট ২০১৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই মাসের ২৯ তারিখ ১১টি দল নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হয় এবং দীর্ঘ প্রায় ১মাস পরিশ্রম করে ২২ আগস্ট ২০১৭ খেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম মহানগর থেকে ২টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল খেলায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে 'ইয়াক বাকসা' বনাম 'হিল গ্যাং'। উভয় টিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের। বেলা ৪:০০টায় খেলার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম মহানগরের সমন্বয়ক শ্রী শরৎ জ্যোতি চাকমা। খেলার উদ্বোধনের শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়ারদের সাথে পরিচয় পর্ব শেষ করে রেফারি খেলা শুরু করেন।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই খেলায় উভয় দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন গোল দিতে না পারায় রেফারি ট্রাইবেকারে খেলার চূড়ান্ত পরিণতি টানেন। এতে ইয়াক বাকসা টিম হিল গ্যাং টিমকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। খেলা শেষে টুর্নামেন্টের সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সহকারী প্রক্টর জনাব লিটন মিত্র, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জুয়েল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি বাবলু

চাকমা, হিল উইমেন ফেডারেশনের সাবেক সদস্য এবং ত্রিপুরা স্টুডেন্ট'স ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক সভাপতি ভ্যালেন্টিনা ত্রিপুরা এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রিটিশ চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেইট শাখার সভাপতি কৃতি চাকমা। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুসংহত করা, নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রামে এক কাতারে নিয়ে আসার লক্ষ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্বিদ্যালয় শাখা এধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকে।' বিশেষ অতিথি ভ্যালেন্টিনা ত্রিপুরা উভয় টিমের খেলোয়ারদের অনেক উৎসাহপূর্ণ খেলা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ অতিথি ছাত্রনেতা বাবলু চাকমা বলেন, 'চট্টগ্রাম মহানগরের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই খেলার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ যে বেড়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের যান্ত্রিক জীবন এবং পড়াশুনার চাপ থাকা সত্ত্বেও পিসিপি কর্তৃক যে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় তা এখানকার পড়ুয়া আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মননশীলতাকে বিকশিত করবে।' তিনি আরো বলেন- 'নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা, ভাব বিনিময়, ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হবে, সম্পর্ক গাঢ় হবে, গভীর থেকে গভীরতর হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে সব বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে। আজকের খেলায় উভয় টিম ভালো খেলা উপহার দিয়েছে। আমরা চমৎকার খেলা উপভোগ করেছি। সবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার পাশাপাশি ঐক্য ধরে রাখতে হবে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে। তিনি খেলায় বিজয়ী টিম এবং রানার আপ টিমকে মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও প্রাণ অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর মৌসুম ভিত্তিক ক্রিকেট এবং ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। এই রকম আয়োজনের মাধ্যমে বিগত সময়ের ন্যায় ভবিষ্যতেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং এই ধারাবাহিকতা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বজায় রাখবে বলে আশা রাখি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীত সহকারী প্রক্টর জনাব লিটন মিত্র যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুরো খেলা দেখতে না পারায় আফসোস করেন। তিনি বলেন, কাজের মধ্যে আটকে পড়ায় যথাসময়ে আসতে পারিনি, খেলা উপভোগ করার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু সেটার সুযোগ হলো না। ভবিষ্যতে মিস হবে না। তিনি আরো বলেন, টুর্নামেন্টের মাঝখানে সামান্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং আমরা প্রক্টরিয়াল বডি সেটার সমাধান করেছি। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক যে সমস্ত প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়, সেগুলোতে আমি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে সহায়তা করবে।

সভাপতির বক্তব্যে ছাত্রনেতা রিটিশ চাকমা এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, খেলার মাঠ কর্তৃপক্ষ, আয়োজক কমিটি, খেলোয়ারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল এবং অপর রানারআপ প্রাপ্ত দলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের প্রোগ্রামে এভাবে আমরা একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চলমান লড়াই সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত রেখে একসাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং সেই লড়াইয়ে আপনাদের বরাবরের মত কাছে পাবো বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্যের পরে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ী এবং রানার আপ উভয় দলকে ট্রপিসহ প্রাইজমানি এবং মেডেল পরিয়ে দেওয়া হয় এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৯তম সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিহত করে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব সমাজের ইস্পাত কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রোজ মঙ্গলবার রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৯তম সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক ছাত্র নেতা এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি টোয়েন চাকমা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা। সঞ্চালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুপিয়ন চাকমা।

সভার শুরুতে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে শহীদ রূপম, সুকেশ, মনতোষ, রন্টু, সমর বিজয়, মংচসিং মারমা, পেশকা মারমাসহ সকল বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার অর্থ সম্পাদক মিকেল চাকমা। স্বাগত বক্তব্যের পর রাঙ্গামাটি শহর শাখার পিসিপির এক বছরের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক অন্তর চাকমা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক বিধায়ক চাকমা উপস্থিত সকল কর্মীদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনাদের সকল পরিচয়ের মধ্যে প্রধান পরিচয় ২ টি। তা হলো: (১) আপনারা প্রত্যেকে একজন শিক্ষার্থী ও (২) আপনারা একজন পিসিপির কর্মী। ৯০% শিক্ষার্থীর লক্ষ্য সার্টিফিকেট অর্জন। বাকি ১০% শিক্ষার্থীই জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে। জ্ঞান অর্জন দুইভাবে করা যায়। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। তিনি সার্টিফিকেট নিয়ে জ্ঞান অর্জন না করে বাস্তবতাকে ঘিরে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান। তিনি বলেন, একজন মানুষের জন্ম হয় দুইবার। প্রথম জন্মটা হয় মায়ের জঠর থেকে বেরিয়ে এসে, দ্বিতীয় জন্ম হয় তখন যখন মানুষ শিক্ষা অর্জন করে মনে মানবতা জেগে উঠে। এম এন লারমার সৈনিক হতে গেলে এম এন লারমাকে জানতে হবে। এম এন লারমা তরুণ বয়সে কাপ্তাই বাঁধের ভয়াবহতার পরিমাণ উপলব্ধি করেছেন এবং সেজন্য প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদের কারণে তিনি দুই বছর পর্যন্ত জেলে ছিলেন। তিনি আরো বলেন, একটি জাতি কখন মুক্ত হবে, তা নির্ভর করে ছাত্র-যুব সমাজের সংগ্রাম ও সক্ষমতার উপর।

ছাত্র যুব সমাজের মধ্যে যারা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার সংগ্রামে বর্তমানে যুক্ত আছে ও ভবিষ্যতে যুক্ত হবে, তাদের এই সংগ্রাম থেকে হারিয়ে না যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো: মহান নেতা এম এন লারমা কর্তৃক নির্দেশিত আদর্শ বা দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করা, তা অনুধাবন করা বা হৃদয়ঙ্গম করা, তা গ্রহণ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগনের বিদ্যমান বাস্তব সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য এই দর্শনের সঠিক প্রয়োগ করা; সংগ্রামী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্তর পেরিয়ে সচেতন স্তরে প্রবেশ করা। এই দর্শন গ্রহণ ও জীবনে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু প্রতিনিয়ত অপমান, শোষণ, বঞ্চনা, দমন, নিপীড়ন আর অত্যাচারের নির্মম কষাঘাতে ধুঁকে ধুঁকে থাকা জুম্ম জনগণের করুন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে এ চ্যালেঞ্জ জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ সচেতনভাবে হাসি মুখে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে, এটাই একান্ত প্রত্যাশা। এই মহান কাজটা করার জন্য 'আগামীকাল খুবই দেরি হয়ে যাবে,কাজে হাত দিতে হবে আজই'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি টোয়েন চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, প্রসিত সঞ্চয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিডিএফ গঠনের মাধ্যমে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন। তিনি ছাত্র যুব সমাজের অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরে বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সারের গণ-অভুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজের যে অংশগ্রহণ তা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ছাত্র-যুব সমাজের অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি ছাত্র-যুব সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১৪টি জাতিগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এ ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল থেকে সেটেলার বাঙালিদের পাহাড়ে পুনর্বাসন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল করার পাঁয়তারা অব্যাহত রেখেছে। এ জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিহার করে বৃহত্তর স্বার্থে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সবাইকে এম এন লারমার আদর্শকে বুকে ধারণ করে আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের পাঁয়তারা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৯৭ সালের

২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণ সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু চুক্তির ১৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেননি।

হিল উইম্যান ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনিরা ত্রিপুরা তার বক্তব্য বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ নারীদের নিরাপত্তা নেই। এখানে প্রতিনিয়ত জুম্ম নারীদের শ্লীলতাহানি, জোরপূর্বক ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ খুন, গুম করা হয়।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তৎকালীন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে তৎকালীন বাঘাইছড়ি উপজেলার কজইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের লেফট্যানেন্ট ফেরদৌসের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি দল কল্পনা চাকমাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করে। অপহরণের প্রায় ২১ বছর পরেও কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার করা হয়নি এবং অপহরণের মামলার সুষ্ঠ বিচার হয়নি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে নারীদের প্রতি চলা হত্যা, গুম নির্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনার বিচার দাবি করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর সাবজেক্ট কমিটি চূড়ান্ত হওয়ার জন্য সঞ্চালক ৫ মিনিটের জন্য আলোচনা সভা বিরতি রাখেন এবং সাবজেক্ট কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক পুলক চাকমা ১৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত সাবজেক্ট কমিটির সদস্যদের নাম হাউজে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনের পর প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষকদের অনুমোদনক্রমে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শহর কমিটি চূড়ান্ত হয়। নব গঠিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক পুলক চাকমা। উক্ত কাউন্সিলে সুপিয়ন চাকমাকে সভাপতি, অতুল বরণ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং মিকেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শহর কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার ২৫তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'আর নয় কালক্ষেপণ, অস্তিত্বের শেকড়ে পড়েছে টান, লড়াই হবে মরণপণ'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির মুনীর চৌধুরী মিলনায়তন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৫তম কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নিপণ ত্রিপুরার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি ক্যারিংটন চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য শ্রী দীপায়ন খীসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা অন্তিক চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী চঞ্চনা চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি উইলিয়াম নকরেক এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি তুহিন কান্তি দাশ প্রমুখ।

জাতীয় সংগীত এবং দলীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া ছাত্র সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক অমর শান্তি চাকমা এবং সাংগঠনিক ও অর্থ রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক তনক তঞ্চঙ্গ্যা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি তুহিন কান্তি দাশ বলেন, স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ নিজ দেশে পরবাসী হয়ে জীবনযাপন করছে। তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৭৮তম জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, এম এন লারমা কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলেননি, তিনি সারা দেশের খেতে খাওয়া, দিন মজুর, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি নব গঠিত কমিটিকে আগাম

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সকল প্রকার ন্যায়সংগত আন্দোলনের সাথে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি উইলিয়াম নকরেক বলেন, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নির্যাতন, নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করছে। সাম্প্রতিক সময়ে মৌলভীবাজার জেলার নাহার খাসিয়া পুঞ্জি, মধুপুরে ভূমি বেদখল প্রভৃতি ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন- ভূমিপুত্রদেরকে নিজ ভূমি থেকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করার মধ্যে দিয়ে শাসক গোষ্ঠী এদেশ থেকে আদিবাসীদেরকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই সমস্ত ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য তথা ন্যায্য অধিকার আদায়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও লড়াই সংগ্রামে সমানভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর সভাপতি চঞ্চনা চাকমা বলেন- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে জুম্ম নারীদেরকে সামিল হতে হবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এজন্য নারীদের প্রতি সবার হীনমন্যতা দূর করা প্রয়োজন। তিনি যে কোন সহিংসতার বিরুদ্ধে সুসংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করার বিকল্প নেই বলেও উল্লেখ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অন্তিক চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা বলে দেয় যে, জুম্ম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে। সেটাকে যদি স্তব্ধ করে দিতে হয় তাহলে লড়াই সংগ্রামের বিকল্প নেই। তিনি সবাইকে সামনের আন্দোলন সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্যও আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দীপায়ন খীসা বলেন, আজকের যে ২৫তম কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলন এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে জুম্ম জনগোষ্ঠীর নতুন নেতৃত্ব উঠে আসবে। একজন দক্ষ, পরিশ্রমী কর্মীই পারবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে। তিনি বলেন, জুম্ম জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা রেখে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির ২০ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর অবাস্তবায়ন সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নে অনিচ্ছা এবং অসদিচ্ছাকে প্রমাণ করে বলে উল্লেখ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্ম থেকে আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ক্যারিংটন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা মোটেই ভালো নেই। লুংগদু পুড়ছে, সাজেক-চিম্বুকে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে, সুজাতা-তুমাচিং ধর্ষিত হচ্ছে সেটেলার বাঙালি দ্বারা। এমতাবস্থায় জুম্ম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে কালক্ষেপণ না করে মরণপণ লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছাত্র যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার ২৫তম কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলনের মাধ্যমে ক্যারিংটন চাকমাকে সভাপতি, নিপণ ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক এবং লালন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও আদিবাসী নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাবিতে পিসিপির বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাজধানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে পাহাড় ও সমতল এলাকায় নির্বিচারে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, মধুপুরে সেটেলার কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণ, পানছড়ি এবং দীঘিনালায় জুম্ম নারী হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে টিএসসি'র সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরার সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি জ্ঞান জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির অর্থ

সম্পাদক অমর শান্তি চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অন্তিক চাকমা, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সতেজ চাকমা প্রমুখ। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস্ কাউন্সিলের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনিমং মারমা।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি অন্তিক চাকমা বলেন, 'আজকে শিক্ষা দিবসে যেখানে আমাদের দাবি হওয়া উচিত শিক্ষা সম্পর্কিত, সেখানে আমাদেরকে পাহাড়ি নারী হত্যার প্রতিবাদে দাঁড়াতে হচ্ছে।' তিনি সরকারকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানান। অন্যথায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার দায়ভার সরকারকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, '৭১ সালে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদেশের পাহাড়ি আদিবাসীরাও যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার বিপরীতে পাহাড়ের মানুষ কেবলমাত্র বৈষম্য, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত নারকীয় যন্ত্রণাগুলোই পেয়েছে।' তিনি সরকারকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সরকার যদি মনে করে আদিবাসীরা দুর্বল হয়ে পড়েছে তারা আর আন্দোলন করতে পারবে না এই ভেবে যদি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তবে আমি বলব সরকার অতীতের ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আবারো সেই ৭০ এর দশকে ফিরে যেতে বাধ্য হবো।'

সতেজ চাকমা তার বক্তব্যে বলেন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূলে রয়েছে শাসকগোষ্ঠীর বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না করার কৌশল।' তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন দাবি করে আরো বলেন 'মায়ানমারের শাসকগোষ্ঠী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর যেসব বর্বর আচরণ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক সংঘটিত সকল গণহত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগের মত সকল মানবতাবিরোধী অপরাধও নিন্দনীয় এবং এসবের বিচার করাটা প্রশাসনের কর্তব্য।'

সংহতি বক্তব্যে বিএমএসসির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনিমং মারমা বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো আবারো ধর্ম রক্ষার জিগির তুলে সক্রিয় হয়েছে। এদের সম্পর্কে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে যেন সাম্প্রদায়িক হামলার মত জঘন্য কাজ আবারো সংঘটিত করতে না পারে।'

অমর শান্তি চাকমা তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব হত্যাকাণ্ড এবং মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ নতুন কিছু নয়। আশির দশকে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পুনর্বাসিত করা সেটেলার বাঙালিরা বহুকাল ধরে প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছত্রছায়ায় এসব ঘটনা সংঘটিত করে আসছে যার একটির সুষ্ঠু বিচার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পায়নি।'

সভাপতির বক্তব্যে জ্ঞানজ্যেতি চাকমা বলেন, ১৬ সেপ্টেম্বর দীঘিনালার মেরুংয়ের মধ্য বোয়ালখালীতে ইন্দ্রা চাকমার হত্যাকারী আলাউদ্দিন এবং পানছড়িতে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার বালাতি ত্রিপুরার খুনীদের খুঁজে বের করে ফাঁসি প্রদান করতে হবে। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সংঘটিত বর্বরতার নিন্দা জানান এবং সেই সাথে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর চলমান হুমকি প্রদান এবং প্রশাসনের মৌনতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখা ও শিজক কলেজ শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রোজ সোমবার সকাল ১০ ঘটিকায় শিজক কলেজ অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার ১৮তম ও শিজক কলেজ শাখার ৩য় বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল ও সম্মেলনে শিজক কলেজ শাখার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক চিবরন চাকমা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সহ-সভাপতি উৎলাক্ষ চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটি সভাপতি শান্তিমোহন চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা, পিসিপি রাঙামাটি জেলা সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙামাটি কলেজ শাখার সদস্য শান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, শিজক কলেজ শাখার স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক এপোলো চাকমা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতিতে বাঘাইছড়ি পিসিপি থানা শাখা খুব দৃঢ়ভাবে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারে। পার্টি কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র ও যুবরা অংশগ্রহণ করবে বলে অতিথিবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামগ্রিক বাস্তবতায় কি করণীয় তা নিয়েও বক্তব্য তুলে ধরে বক্তারা।

সবশেষে সোহেল চাকমাকে সভাপতি, সাধন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও আশাপূর্ণ চাকমাকে সাংগঠনিক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট বাঘাইছড়ি থানা শাখা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয় এবং চিরঞ্জীব চাকমাকে সভাপতি, উদ্দীপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মেনশন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট শিজক কলেজ কমিটি গঠিত হয়। নব কমিটিদ্বয়কে শপথবাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা।

লংগদু উপজেলার বরকলগে মতবিনিময় সভা ও কর্মীসভা

কঠোর আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদারকরণ ও পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন বরকলগ এলাকার হাইস্কুল পাড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির এক জনসভা এবং একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার ৭নং লংগদু সদর ইউনিয়নের ৯টি গ্রাম থেকে প্রায় আড়াই শতাধিক এলাকাবাসী সভায় যোগদান করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ৭নং লংগদু সদর ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি নসিক চাকমা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক চিংহ্লামং চাক। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি লংগদু থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মিলন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিনয় সাধন চাকমা। লংগদু সদর যুব ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন চাকমার উপস্থাপনায় সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অমিয় চাকমা, প্রসেনজিৎ চাকমা, কাট্টলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিমির কান্তি চাকমা ও তপন চাকমা।

বক্তারা বলেন, সরকার ২০ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এখনও চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সরকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন, স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজগুলো ঝুলিয়ে রেখেছে। অধিকন্তু সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর অবস্থায় রেখে দিয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করার বিপরীতে চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং জনসংহতি সমিতিকে দুর্বল করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের কোন সদিচ্ছা নেই। তাই কঠোর আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর দমন-পীড়ন, গুম, হত্যা, নির্যাতন, হয়রানি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর খুন, জমি বেদখল ইত্যাদি মানবতা বিরোধী ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বরকলগ বৌদ্ধ বিহারে ৯টি গ্রামের পার্টির গ্রাম কমিটি ও যুব সমিতির কর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন লংগদু থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মিলন চাকমা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রিপন চাকমা।

পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুঁখে দাড়াও, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ফারুখপাড়া কমিউনিটি হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাসিং মারমার সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের বান্দরবান জেলা শাখার সাধারন সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় প্রথম অধিবেশনে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য কে এস মং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি এবং রুমা উপজেলা চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা।

আলোচনা সভার শুরুতে সকাল ১০ঘটিকায় জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাধারন সম্পাদক প্রু নু অং মারমা এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান বাস্তবতা তুলে ধরেন। তাছাড়া শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু থেকে সখংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য সর্বোপরি বিলুপ্ত করার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র, তা সত্ত্বেও পিসিপি ভিন্ন ভাষা-ভাষি ১৪টি আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই শাষকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে ছাত্র-যুব সমাজের এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রধান অথিতির বক্তব্যে কে এস মং মারমা বলেন, পিসিপি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম, বিপ্লবী সংগঠনের নাম, লাখো জুম্ম জনগণের আস্থার নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পিসিপির জন্ম লাভ করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কখনো আপস করেনা, শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানিকে কখনো ভয় করে না, বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯৮৯ সালে ৪ঠা মে লংগদুর গণহত্যার প্রতিবাদে এবং রক্ত হোলিখেলা থেকে ১৯৮৯ সালে ২০ মে এই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জন্ম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এই সংগ্রামী ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য পিসিপি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামগ্রিক বাস্তবতা সম্পর্কেও পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনো পর্যন্ত চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো সরকার বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে জুম্ম জনগণের মনে হতাশা আর ক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই ক্ষোভ একদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেঁটে পড়বে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন করতে সরকার বাধ্য হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্টির কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পিসিপি আগে যেমনি এক হাতে বই, আরেক হাতে লড়াইয়ের নিশান নিয়ে মাঠে কাজ করেছে তেমনি বর্তমান পিসিপি কর্মীদের সেভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অংথোয়াইচিং মারমা বলেন, বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখনি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, গুম, ভূমি বেদখল হয়েছে, তখনি ছাত্র-যুব সমাজ প্রতিবাদ করেছে এবং রুখে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি পূর্বের চাইতেও ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই ছাত্র ও যুব সমাজকে এই অন্যায়ের প্রতি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা বলেন, আজ আমাদের সংগঠন করার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা দেওয়ার নামে শাসক গোষ্ঠী আজ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে, পর্যটনের নামে, বনায়নের নামে চোখের সামনে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। তিনি ছাত্র-যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, সাহসিকতা মানে সবসময় গর্জে উঠা নয়, সাহসিকতা মানে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপে গর্জে উঠা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান বাস্তবতার আলোকে ছাত্র যুব সমাজকে সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উবাসিং মারমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলন ও কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে বেলা ২:০০ ঘটিকায় সম্মেলনের ২য় অধিবেশনে শুরু হয়। ২য় অধিবেশনে সংগঠনের বান্দবান জেলার সভাপতি উবাচিং মারমার সভাপতিত্বে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলার সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি মন্তু মারমা। দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে পর্যবেক্ষক ও প্রতিনিধিদের সামনে বান্দরবান জেলা পিসিপির সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা। এরপর বান্দরবান জেলার বিভিন্ন থানা থেকে আসা প্রতিনিধিবৃন্দরা নিজেদের সাংগঠনিক এলাকার স্ব স্ব প্রতিবেদন পেশ করেন।

সবশেষে ১৭তম কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে অজিত তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, প্রু নু অং মারমাকে সাধারন সম্পাদক ও পরিমল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা কমিটি এবং ৮ম কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে থোয়াইক্য যাই চাককে সভাপতি, বাঅং সিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও গোপাল চন্দ্র চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বান্দরবান সরকারি কলেজ কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিদ্বয়কে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিন্টু ত্রিপুরা।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

'জুম্ম নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করুন'- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১১ অক্টোবর ২০১৭ রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিন্টু চাকমা প্রমুখ। মণিরা ত্রিপুরার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য শৈএনু মারমা। সম্মেলনে সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান অতিথি উষাতন তালুকদার এবং দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার এমপি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার কথা বলা হয়েছে। সমাবেশ-মিটিং-মিছিল করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক অধিকারের চর্চা করছি। আমরা এখানে কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছি না। কিন্তু হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে কেন বাধা দেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে বাধাগ্রস্ত করবেন না। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনগুলো প্রশাসনকে লিখিতভাবে অবহিত করে এযাবৎ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। সে হিসেবে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আজকের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ সম্মেলনের অনুমতি নেই বলে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত আজকের এই সম্মেলনকে বাধা দেয়া হচ্ছে। সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করে তিনি বলেন, আমাদের কোন দূরভিসন্ধি নেই। দয়া করে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবেন না। আমাদের কার্যকলাপের ফলে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা কোন রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করছি না। আমরা হলের ভেতরে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলোচনা করছি মাত্র। অহেতুকভাবে ভুল বুঝা হচ্ছে, অহেতুকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পরিশেষে তিনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, হাজারো প্রতিকূলতার মুখে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জুম্ম নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, আপনারা নিজেদেরকে ছোট ভাববেন না। একজন পুরুষ হিসেবে যেমন অধিকার ভোগ করতে পারে, একজন নারী হিসেবেও মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। জনসংহতি একটি আদর্শিক সংগঠন। এই সংগঠনের নীতি-আদর্শকে আমাদের পথ চলতে হবে। চে গুয়েভারা বলেছেন, মৌমাছিরা যেমন সারাক্ষণ গুণগুণ করে, আমাদেরকেও যেমনি সারাক্ষণ জনগণের কাছে গিয়ে অধিকারের কাছে বলতে হবে।

৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে মণিরা ত্রিপুরাকে সভাপতি, আশিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং শৈএনু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য-বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিদায়ী সভাপতি চঞ্চনা চাকমা।

উল্লেখ্য যে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন গতকাল ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অন্য একটি সরকারি কর্মসূচির কারণে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের অনুরোধে ১১ অক্টোবরে স্থানান্তর করা হয়েছে। তদনুসারে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে রাঙ্গামাটি জেলার

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয় এবং নিরাপত্তাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়। তদনুসারে সকাল ৮:০০ টার দিকে একদল পুলিশও সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সম্মেলন শুরু হওয়ার ঘন্টা খানেক পর সম্মেলনের অনুমতি নেয়া হয়নি বলে সম্মেলন বন্ধ করার জন্য চাপ দেয়া হতে থাকে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রশাসনের এই অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী কায়দায় বাধা প্রদানের অপচেষ্টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এটা সংবিধানে স্বীকৃত সভা-সমিতির অধিকার, বাক-স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিসিপির নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

গত ১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে 'জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আত্মকেন্দ্রীকতা নয়, আত্মত্যাগই হোক ছাত্র সমাজের দৃপ্ত অঙ্গীকার'- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'নবীনবরণ ও প্রবীন বিদায় ২০১৭' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মনস্বী চাকমার সঞ্চালনায় ও সহ-সভাপতি রামভাই পাংখোয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জুয়েল চাকমা, পালিবিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, আধুনিক ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জেসী ডেইজি মারাক, ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আনন্দ বিকাশ চাকমা, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম এবং প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা প্রমুখ।

আলোচনা সভার শুরুতে ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মৃতিতে ২০১২-১৩' স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করেন ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম এবং ফুল দিয়ে বিদায়ীদের সংবর্ধনা জানান উষাতন তালুকদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, মানব জীবন খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্র জীবনটাও ছোট্ট জীবনের অংশ। এ ছাত্রজীবনে যে সময়টা সৎ ব্যবহার করবে, সে জীবনে ভালো কিছু করতে পারবে। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেও বাস্তবতার নিরিখে তোমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বর্তমান বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ ও অগণতান্ত্রিক শক্তি মাথা সাড়া দিয়ে উঠেছে। যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় বেশি প্রযোজ্য। গত ১৩ অক্টোবরে রাংগামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৯ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বাধা দেওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, একটা গণতান্ত্রিক দেশে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, সম্মেলন করার প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। এখানে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। একটা স্বাধীন দেশে এমন অগণতান্ত্রিক আচরণ কারোর জন্য সুফল বয়ে আনবে না।

শ্রী তালুকদার আরো বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয় বলে দীর্ঘ ২০ বছরেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। উল্টো চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র যেমন ভূমি বেদখল থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক হামলা, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে সংগঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কোম্পানীর নামে লীজ দিয়ে, সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে, তথাকথিত উন্নয়নের নামে, বনায়নের নামে, পর্যটন শিল্প সম্প্রসারণের নামে ভূমি বেদখল হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জুয়েল চাকমা বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় এম এন লারমা শুধুমাত্র জুম্ম জনগণের কথা বলেননি, তিনি সমগ্র দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও খেটে খাওয়া মানুষদের কথা বলেছেন দৃঢ়চিত্তে। নবীন শিক্ষার্থীদের তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নবীন এবং প্রবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, আপনারা যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করতে এসেছেন সে শিক্ষা কিসের জন্য, কাদের জন্য তা আগে উপলব্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য একটা চাকরি নাকি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র নিপীড়িত-নিষ্পেষিত, অধিকারহারা জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের এই শিক্ষা তা মীমাংসা করা দরকার। আপনারা বাঘাইছড়ির সাজেক, জুরাছড়ির বগাখালী, বান্দরবানের রেমাক্রি, থানচির দুর্গম অঞ্চলে যান, ঘুরে দেখলে বুঝবেন জুম পাহাড়ের মানুষগুলো কিভাবে অর্থনৈতিক, শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে এবং বান্দরবানে বহিরাগতদের জন্য ৫০,০০০ একর জমি লীজ দিয়ে সেখানকার ভূমিপুত্র মারমা, ত্রিপুরা, ম্রোদের উচ্ছেদ করে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র, পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫টি পর্যটন স্পটের জন্য বরাদ্দকৃত শত শত একর জমি অধিগ্রহণ করার ষড়যন্ত্রের ফলে যেখানে হাজার বছর ধরে বসবাসকরা ভূমিপুত্ররা উচ্ছেদের হুমকিতে তা অনুধাবন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ৫০০টির অধিক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও গত ২০ বছরে মাত্র ৬৬টি ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। জনম দুঃখী জুম পাহাড়ের মানুষদের কান্না, আর্তনাদ, হাহাকার অন্তরের চোখ দিয়ে না দেখলে আপনারা দেখতে পাবেন না। সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও দীর্ঘ ২০ বছর কালক্ষেপণ করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং করেই চলেছে। তিনি ছাত্র-যুব সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে ভোগ-বিলাস ও আত্মকেন্দ্রীকতা বাদ দিয়ে, আত্মত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানান। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি রামভাই পাংখোয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এরপর বিকাল ৪:০০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুন চাকমা ও ধর্মরাজ তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য থৈোয়াচিং চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য থৈোয়াচিং চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতি গভীর শোক জানিয়েছে। গত ৭ জুন ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫০ বছর বয়সে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পরে হাসপাতাল থেকে মরদেহ তাঁর বাসভবন আঞ্চলিক পরিষদ রেষ্ট হাউজে নিয়ে আসা হলে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর দুপুর দুই ঘটিকার সময় তাঁর মরদেহ বহনকারী গাড়িটি খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার নিজ গ্রামের বাড়ি মাষ্টারপাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানে পরদিন বিকাল ৩ ঘটিকায় মাষ্টারপাড়া শ্মশানে তাঁর দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তানসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের এমপি'র বাঘাইছড়িতে জনসংযোগ
সরকার পার্বত্য চুক্তির মূল বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে- ঊষাতন তালুকদার এমপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে; কিন্তু চুক্তির মূল বিষয়সমূহ সরকার এখনও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চরম প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করার পাশাপাশি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, আভ্যন্তরীণ ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন, পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন, জনগণের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি নিশ্চিত করা যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এখানে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা। কিন্তু রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়ন এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি বিরোধী ভূমিকার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারছে না।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা সফরকালে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার এই মতামত তুলে করেন। জনসংযোগকালে তিনি সিজক কলেজ, সিজক মুখ বিহার, খেদারমারাস্থ নরেশ মৈত্রী বিহার, খেদারমারা উচ্চ বিদ্যালয়, উলুছড়ি মৌজা হাইস্কুল, উলুছড়ি জীবমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার, বঙ্গলতলী এলাকা, বিটি হাইস্কুল, তুলাবান হাইস্কুল, নূর আলী মাদ্রাসা, কাচালং ডিগ্রি কলেজ, জীবঙ্গছড়া নবরত্ন বৌদ্ধ বিহার, বাঘাইছড়ি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘাইছড়ি ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, নবজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, দোজর বেনুবন ভাবনা কুটির, দোজর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সার্বোয়াতলী হাইস্কুল, উত্তর সার্বোয়াতলী বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। তিনি বাঘাইছড়ি উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনময় সভায় মিলিত হন।

> “ শাসকশ্রেণির একটা কায়েমী স্বার্থান্বেষী অংশ যারা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তারা জুম্মদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে একেবারে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছে। এটা জুম্মদের সাথে সরকারের চরম প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মতবিনিময় কালে উষাতন তালুকদার বলেন, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জুম্মদেরকে দূরে ঠেলে দিয়ে নয়, বরং তাদের কাছে টেনে নিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জুম্মরা দেশের স্বাধীনতার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানেও তারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রশংসীয় ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু শাসকশ্রেণির একটা কায়েমী স্বার্থান্বেষী অংশ যারা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তারা জুম্মদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে একেবারে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছে। এটা জুম্মদের সাথে সরকারের চরম প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শ্রী তালুকদার আরো বলেন, বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে জয়যুক্ত করতে সহযোগিতা দিয়েছে। কিন্তু তারা নির্বাচিত হয়ে জুম্মদের জাতিগত পরিচয় এবং মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখেনি বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

উষাতন তালুকদার এমপির জনসংযোগে অন্যান্যের মধ্যে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা, সুশীল বিকাশ চাকমা জন এবং জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার কর্মীবৃন্দ।

জ্যোতিপ্রভা লারমাকে বীরকন্যা প্রীতিলতা স্মারক সম্মাননা প্রদান

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় অবস্থিত বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাবেক সহ সভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমাকে বীরকন্যা প্রীতিলতা স্মারক সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্টের উদ্যোগে 'বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন' উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২০ অক্টোবর ২০১৭ দ্বিতীয় পর্বে স্মারক সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, লোককবির আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিকাল আড়াই টায় অনুষ্ঠিত উক্ত ২য় পর্বের অনুষ্ঠানমালায় সভাপতিত্ব করেন বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পংকজ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: রফিকুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, বিশিষ্ট নারীনেত্রী নুরজাহান খান, জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভার শেষ দিকে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মো: রফিকুল ইসলাম সম্মাননা স্মারক তুলে দেন জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনুসহ সুলতানা কামাল, গীতি আরা নাসরিন ও নুরজাহান খানকে।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন আপোষহীন সংগ্রামী নারী আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মরণে আমাকে তাঁর স্মারক সম্মাননা প্রদান করায় আমি বিশেষভাবে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। তিনি আরো বলেন, বিপ্লবী কন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর মহান আত্মত্যাগ যে কোন মুক্তিকামী মানুষকে স্বাধীন ও মর্যাদার সাথে বাঁচতে সংগ্রামী হতে পথ দেখায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বিপ্লবী প্রীতিলতার সংগ্রামী চেতনা, সাহস ও আত্মবলিদান নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এই মহিয়ষী নারীর আদর্শ জুম্ম নারী সমাজকে সংগ্রামী হতে উজ্জীবিত ও সাহসী করেছে বলে শ্রীমতি লারমা জানান।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০ টায় প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে প্রীতিলতা ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর 'বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন' উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পংকজ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ১ম পর্বের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য এবং পরিকল্পনা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব সামশুল হক চৌধুরী ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত।

"গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।"

সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org